নানা ফুলের সাজি

৩



সূচীপত্র



শৈশব-স্মৃতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[লেখক পরিচিতি ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর জন্ম ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর, মৃত্যু ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই। পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম ভগবতী দেবী। বাল্যকালে দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটে। তিনি ১২ বছর ধরে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যয়ন করেন। কিছুকাল ইংরেজি ভাষাও শিক্ষা করেন। তাঁহাকেই প্রথম 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, বহু বিবাহ নিবারণ, স্ত্রীসমাজ-সংস্করণ, স্ত্রীশিক্ষা প্রসার প্রভৃতির তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। বাংলা গদ্য সাহিত্যের তিনি ছিলেন প্রথম সার্থক শিল্পী। বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য তিনি বহু গ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে আখ্যান মঞ্জরী, বোধোদয়, বর্ণপরিচয়, কথামালা, বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, বিদ্যাসাগর চরিত প্রভৃতি বিখ্যাত।]

প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, সিয়াখালায় সালিখার বাঁধারাস্তায় উঠিয়া, বাটনাবাটা শিলের মত একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোঁতা দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোঁতা আছে কেন? তিনি আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন ও শিল নয়, উহার নাম মাইল স্টোন। আমি বলিলাম, বাবা মাইল স্টোন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, এটি ইঙ্গরেজী কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ; স্টোন শব্দের অর্থ পাথর; এই রাস্তার আধ ক্রোশ অন্তরে, এক একটি পাথর পোঁতা আছে; উহাতে এক, দুই, তিন প্রভৃতি অংক খোদা রহিয়াছে; এই পাথরের অংক উনিশ; ইহা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে এখান হইতে কলিকাতা উনিশ মাইল, অর্থাৎ সাড়ে নয় ক্রোশ। এই বলিয়া তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন।

নামতায় "একের পিঠে নয় উনিশ" ইহা শিখিয়াছিলাম। দেখিবামাত্র আমি প্রথমে এক অঙ্কের তৎপরে নয় অঙ্কের উপর হাত দিয়া বলিলাম, তবে এইটি ইঙ্গরেজীর এক আর এইটি ইঙ্গরেজীর নয়। অনন্তর বলিলাম, তবে বাবা, ইহার পর যে পাথরটি আছে, তাহাতে আঠার, তাহার পরটিতে সতের, এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক পর্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইবে, প্রথম মাইল স্টোন যেখানে পোঁতা আছে, আমরা সেদিক দিয়া যাইব না। যদি দেখিতে চাও, একদিন দেখাইয়া দিব। আমি বলিলাম, সেটি দেখিবার আর দরকার নাই; এক অঙ্ক এইটিতেই দেখিতে পাইয়াছি। বাবা, আজ পথে যাইতে যাইতেই, আমি ইঙ্গরেজী অঙ্কগুলি চিনিয়া ফেলিব।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, প্রথম মাইল স্টোনের নিকটে গিয়া আমি অঙ্কগুলি দেখিতে ও চিনিতে আরম্ভ করিলাম। মনবেড় চটিতে দশম মাইল স্টোন দেখিয়া, পিতৃদেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম, বাবা, আমার ইঙ্গরেজী অঙ্ক চিনা হইল। পিতৃদেব বলিলেন, কেমন চিনিয়াছ, তাহার পরীক্ষা করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি নবম, অষ্টম, সপ্তম, এই তিনটি মাইল স্টোন ক্রমে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আমি—এটি নয়, এটি আট, এটি সাত, এইরূপ বলিলাম। পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অঙ্কগুলি চিনিয়াছি, অথবা নয়ের পর আট, আটের পর সাত অবধারিত আছে ইহা জানিয়া চালাকি করিয়া নয়, আট, সাত বলিতেছি! যাহা হউক, ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, কৌশল করিয়া, তিনি আমাকে ষষ্ঠ মাইল স্টোনটি দেখিতে দিলেন না; অনন্তর পঞ্চম মাইল স্টোনটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কোন্ মাইল স্টোন বল দেখি? আমি দেখিয়া বলিলাম, বাবা, এই মাইল স্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে; এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া, পিতৃদেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারীরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম।



ভবচন্দ্র রাজা গবচন্দ্র মন্ত্রী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[লেখক-পরিচিতি ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী ঔপন্যাসিক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান ২৪-পরগণা জেলার নৈহাটির নিকট কাঁঠালপাড়া নামক স্থানে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম বি. এ. পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী। কর্মজীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হলেও ছাত্রাবস্থায় সাহিত্যসেবী বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের কথা ভোলেন নি। তাই বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান অতুলনীয়। প্রথম জীবনে তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। দুর্গেশনন্দিনী তাঁহার প্রথম উপন্যাস। কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ উপন্যাস; 'কমলাকান্তের দপ্তর' 'লোক রহস্য' প্রভৃতি প্রবন্ধ পুস্তক তিনি রচনা করেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

এই লেখাটি হাস্যরসাত্মক রচনা। ছোট বড় সকলেই এই রস রচনাটি পড়ে আনন্দ পেয়ে থাকবে। এই কাহিনীটি কমলাকান্তের দপ্তর থেকে নেওয়া।]

ভবচন্দ্র গবচন্দ্রের বুদ্ধিবিদ্যার পরিচয় লোকপ্রবাদে এত আছে যে, তাহার পুনরুক্তি না করিলেও হয়। গবচন্দ্র বুদ্ধি বাহির হইয়া যাইবে ভয়ে টিপুলে দিয়া নাক-কান বন্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, পাছে বুদ্ধি বাহির হইয়া যায় ভয়ে সিন্দুকে গিয়া লুকাইয়া থাকিতেন, রাজার কোন বিপদ-আপদ পড়িলে, সিন্দুক হইতে বাহির হইয়া, নাক-কানের পুঁটুলি খুলিয়া বুদ্ধি বাহির করিতেন।

একদিন রাজার এইরূপ এক বিপদ উপস্থিত, নগরে একটা শূকর দেখা দিয়াছে। শূকর রাজসমীপে আনীত হইলে রাজা কিছু স্থির করিতে পারিলেন না যে, এ কি জন্তু! বিপদ আশঙ্কা করিয়া মন্ত্রীকে সিন্দুক হইতে বাহির করিলেন। মন্ত্রী টিপ্‌লে খুলিয়া অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, এটা অবশ্য হস্তী; না খাইয়া রোগা হইয়াছে; নচেৎ ইন্দুর; খাইয়া মোটা হইয়াছে।

আর একদিন দুইজন পথিক আসিয়া সায়াহ্নে এক পুষ্করিণী তীরে উপস্থিত হইল। রাত্রে পাকশাক করিবার জন্য সরোবর-তীরে স্থান পরিষ্কার করিয়া চুলা কাটিতে আরম্ভ করিল। নগরের রক্ষিবর্গ ইহা দেখিয়া মনে করিল যে, যখন পুকুর থাকিতেও তাহার কাছে খানা কাটিতেছে, তখন অবশ্য ইহাদের অসৎ অভিপ্রায় আছে। রক্ষিগণ পথিক দুইজনকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজ-সন্নিধানে লইয়া গেল। রাজা স্বয়ং এরূপ গুরুতর সমস্যার কিছুই মীমাংসা করিতে না পারিয়া, পরম ধীমান্ পাত্র মহাশয়কে সিন্দুকের ভিতর হইতে বাহির করিলেন। তিনি নাক-কান-এর টিপ্‌লে খুলিয়াই দিব্যচক্ষে কাণ্ডখানা দর্পণের মত পরিষ্কার দেখিলেন। তিনি আজ্ঞা করিলেন —"নিশ্চিত ইহারা চোর। পুকুরটা চুরি করিবার জন্য পাড়ের উপর সিঁধ কাটিতেছিল। ইহাদিগকে শূলে দেওয়া বিধেয়।" রাজা ভবচন্দ্র মন্ত্রীর বুদ্ধি প্রাখর্যে মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণেই পুষ্করিণী চোরদ্বয়ের প্রতি শূলে যাইবার বিধি প্রচার করিলেন।

কথা এখনও ফুরায় নাই। পুকুর-চোরেরা শূলে যাইবার পূর্বে পরামর্শ করিয়া হঠাৎ পরস্পর ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিল। রাজা ও রাজমন্ত্রী এই বিচিত্র কাণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি?" তখন একজন চোর নিবেদন করিল—"হে মহারাজ! দেখুন, দুই শূলের মধ্যে একটি বড়; একটি ছোট। আমরা জ্যোতিষ জানি। আমরা গণনা করিয়া জানিয়াছি যে, আজ যে ব্যক্তি এই দীর্ঘ শূলে আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, পরজন্মে চক্রবর্তী রাজা হইয়া সে সদ্বীপা-সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে; আর যে

এই ছোট শূলে মরিবে, সে তাহার মন্ত্রী হইয়া জন্মিবে। মহারাজ, তাই আমি দীর্ঘ শূলে চড়িতে যাইতেছিলাম—এই হতভাগা আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে, নিজে বড় শূলে মরিয়া সম্রাট হতে চায়।" তখন দ্বিতীয় চোর জোড়হাত করিয়া বলিল—"মহারাজ, ও কে যে, ও চক্রবর্তী রাজা হইবে? আমি কেন না হইব? আজ্ঞা হউক, ও ছোট শূলে চড়ুক, আমি সম্রাট হইব, ও আমার মন্ত্রী হইবে।" তখন রাজা ভবচন্দ্র ক্রোধকম্পিত কলেবর হইয়া বলিলেন—"কি এত বড় স্পর্ধা! তোরা চোর হইয়া জন্মান্তরে চক্রবর্তী রাজা হইতে চাহিস! সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত পাত্র যদি কেহ থাকে, তবে সে আমি। আমি থাকতে তোরা?" এই বলিয়া রাজা ভবচন্দ্র তখন দ্বারিগণকে আজ্ঞা দিলেন যে—এই পাপাত্মাদিগকে তাড়াইয়া বাহির করিয়া দাও এবং মন্ত্রিবরকে আহ্বানপূর্বক সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্যের লোভে স্বয়ং উচ্চশূলে আরোহণ করিলেন। মন্ত্রী মহাশয়ও আগামী জন্মে তাদৃশ চক্রবর্তী রাজার মন্ত্রী হইবার লোভে ছোট শূলে গিয়া চড়িলেন। এইরূপে তাঁহাদের ভবলীলা সমাপ্ত হইল।



দান-প্রতিদান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[লেখক-পরিচিতি ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর জন্ম ৭ই মে ১৮৬১ ; মৃত্যু ১৯৪১। নিবাস জোড়াসাঁকো কলিকাতা। পরে শান্তিনিকেতন বীরভূম। রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের বন্ধু। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র। স্কুল কলেজে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখলেও তাঁর প্রতিভাবলে পৃথিবীর বিখ্যাত কবিদের অগ্রগণ্য হয়েছিলেন। গল্প, উপন্যাস, ব্যঙ্গ কৌতুক, দিনলিপি, ভ্রমণকাহিনী, ধর্মোপদেশ, শিক্ষা, রাজনীতি, শব্দ, ছন্দ, ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, নাটক, ভাষাকাব্য, রূপক প্রহসন, কবিতা, জ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত বিষয় রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' পান। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী নতুন শিক্ষা পরিচালনার বিশিষ্ট নিদর্শন। আলোচ্য গল্পটি তাঁর 'গল্পগুচ্ছ' থেকে সংকলিত। বাঙালীর মধ্যবিত্তের সুখ দুঃখের কথাই এই গল্পে বলা হয়েছে।]

রাধামুকুন্দ ও শশিভূষণ সহোদর ভাই নহে নিতান্ত নিকট সম্পর্কও নয়, প্রায় গ্রাম সম্পর্ক বলিলেই হয়। কিন্তু প্রীতিবন্ধন সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কিছু কম নহে। বড়ো গিন্নি ব্রজসুন্দরীর সেটা কিছু অসহ্যবোধ হইত। বিশেষতঃ শশিভূষণ দেওয়া থোওয়া সম্বন্ধে ছোট বউয়ের অপেক্ষা নিজ স্ত্রীর প্রতি অধিক পক্ষপাত করিতেন না। বরঞ্চ যে জিনিস একান্ত একজোড়া না মিলিত সেটা গৃহিণীকে বঞ্চিত করিয়া ছোটবউকেই দিতেন। তাহা ছাড়া অনেক সময়ে তিনি স্ত্রীর অনুরোধ অপেক্ষা রাধামুকুন্দের পরামর্শের উপর বেশী নির্ভর করিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

শশিভূষণ লোকটা নিতান্ত ঢিলাঢালা রকমের, তাই ঘরের কাজ

এবং বিষয় কর্মের সমস্ত ভার রাধামুকুন্দের উপরই ছিল। বড় গিন্নির সর্বদাই সন্দেহ, রাধামুকুন্দ তলে তলে তাঁহার স্বামীকে বঞ্চনা করিবার আয়োজন করিতেছে—তাহার যতই প্রমাণ পাওয়া যাইত না, রাধার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ততই বাড়িয়া উঠিত। মনে করিতেন, প্রমাণগুলোও অন্যায় করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। এইজন্য তিনি আবার প্রমাণের উপর রাগ করিয়া তাহাদের প্রতি নিরতিশয় অবজ্ঞা-প্রকাশ-পূর্বক নিজের সন্দেহকে ঘরে বসিয়া দ্বিগুণ দৃঢ় করিতেন। তাঁহার এই বহু যত্নোপোষিত মানসিক আগুন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় ভূমিকম্প-সহকারে প্রায় মাঝে মাঝে উষ্ণ ভাষায় উচ্ছ্বসিত হইত।

রাত্রে রাধামুকুন্দের ঘুমের ব্যাঘাত হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু পরদিন সকালে উঠিয়া তিনি বিরসমুখে শশিভূষণের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। শশিভূষণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করলেন, "রাধে তোমায় এমন দেখিতেছি কেন? অসুখ হয় নাই তো?"

রাধামুকুন্দ মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা, আর তো আমার এখানে থাকা হয় না।" এই বলিয়া গত সন্ধ্যাকালে বড়ো-গৃহিণীর আক্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষেপে ও শান্তভাবে বর্ণনা করিয়া গেলেন।

শশিভূষণ হাসিয়া কহিলেন, "এই! এ তো নূতন কথা নহে। ও তো পরের ঘরের মেয়ে, সুযোগ পাইলেই দুটো কথা বলিবে, তাই বলিয়া কি ঘরের লোককে ছাড়িয়া যাইতে হইবে? কথা আমাকেও তো মাঝে মাঝে শুনিতে হয়, তাই বলিয়া তো সংসার ত্যাগ করিতে পারি না।"

রাধা কহিলেন, "মেয়েমানুষের কথা কি আর সহিতে পারি না, তবে পুরুষ হইয়া জন্মিলাম কী করিতে? কেমন ভয় হয় তোমার সংসারে পাছে অশান্তি ঘটে"!

শশিভূষণ কহিলেন, "তুমি গেলে আমার কিসের শান্তি"।

আর অধিক কথা হইল না ; রাধামুকুন্দ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয়ভার সমান রহিল।

এদিকে বড়োগৃহিণীর আক্রোশ ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে। সহস্র উপলক্ষ্যে যখন-তখন তিনি রাধাকে খোঁটা দিতে পারিলে ছাড়েন না ; মুহুর্মুহুঃ বাক্যবাণে রাসমণির অন্তরাত্মাকে একপ্রকার শরশয্যাশায়ী করিয়া তুলিলেন। রাধা যদিও চুপচাপ করিয়া তামাক টানেন এবং স্ত্রীকে ক্রন্দনোন্মুখী দেখিবামাত্র চোখ বুজিয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করেন, তবু ভাবে বোধ হয়, তাঁহারও অসহ্য হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু শশিভূষণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক তো আজিকার নহে। দুই ভাই যখন প্রাতঃকালে পান্তাভাত খাইয়া পাততাড়ি কক্ষে একসঙ্গে পাঠশালায় যাইত, উভয়ে যখন একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দিয়া পাঠশালা হইতে পালাইয়া রাখাল ছেলেদের সঙ্গে নানাবিধ খেলা ফাঁদিত, এক বিছানায় শুইয়া স্তিমিত আলোকে মাসির নিকট গল্প শুনিত, ঘরের লোককে লুকাইয়া রাত্রে দূর পল্লীতে যাত্রা শুনিতে যাইত এবং প্রাতঃকালে ধরা পড়িয়া অপরাধ এবং শাস্তি উভয়ে সমান ভাগ করিয়া লইত, তখন কোথায় ছিল ব্রজসুন্দরী, কোথায় ছিল রাসমণি ? জীবনের এতগুলো দিনকে কি একদিনে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাওয়া যায় ? কিন্তু এই বন্ধন যে স্বার্থপরতার বন্ধন, এই প্রগাঢ় প্রীতি যে পরান্ন প্রত্যাশার সুচতুর ছদ্মবেশ—এরূপ সন্দেহ, এরূপ আভাসমাত্র তাঁহার নিকট বিষতুল্য বোধ হইত। অতএব আর কিছুদিন এরূপ চলিলে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু এমন সময়ে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের মধ্যে গভর্নমেণ্টের খাজনা শোধ না করিলে জমিদারি সম্পত্তি নিলাম হইয়া যাইত।

একদিন খবর আসিল শশিভূষণের একমাত্র জমিদারি পরগণা এনাৎশাহী লাঠের খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া গেছে।

রাধামুকুন্দ তাঁহার স্বাভাবিক মৃদু প্রশান্তভাবে কহিলেন, "আমারই দোষ।"

শশিভূষণ কহিলেন, "তোমার কিসের? তুমি তো খাজনা চালান দিয়াছিলে, পথে যদি ডাকাত পড়িয়া লুটিয়া লয় তুমি তাহার কী করিতে পার?"

দোষ কাহার এক্ষণে তাহা স্থির করিতে বসিয়া কোনো ফল নাই—এখন সংসার চালাইতে হইবে। শশিভূষণ হঠাৎ যে কোনো কাজ-কর্মে হাত দিবেন সেরূপ তাঁহার স্বভাব ও শিক্ষা নহে। তিনি যেন ঘাটের বাঁধা সোপান হইতে পিছলাইয়া একমুহূর্তে ডুবজলে গিয়া পড়িলেন।

প্রথমে তিনি স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিতে উদ্যত হইলেন। রাধামুকুন্দ এক-থলে টাকা সম্মুখে ফেলিয়া তাহাতে বাধা দিলেন—তিনি পূর্বেই নিজ স্ত্রীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সংসারে একটা মহৎ পরিবর্তন দেখা গেল—সম্পৎকালে গৃহিণী যাহাকে দূর করিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিপৎকালে তাহাকে ব্যাকুলভাবে অবলম্বন করিয়া ধরিলেন। এই সময় দুই ভ্রাতার মধ্যে কাহার উপরে অধিক নির্ভর করা যাইতে পারে বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কখনো যে রাধামুকুন্দের প্রতি তাঁহার তিলমাত্র বিদ্বেষ ভাব ছিল এখন আর তাহা প্রকাশ পায় না।

রাধামুকুন্দ পূর্ব হইতে স্বাধীন উপার্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। নিকটবর্তী শহরে সে মোক্তারি আরম্ভ করিয়াছিল। তখন মোক্তারী ব্যবসায়ে আয়ের পথ এখনকার অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল, এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাবধানী রাধামুকুন্দ প্রথম হইতেই পসার জমাইয়া তুলিল। ক্রমে সে জেলার অধিকাংশ বড়ো বড়ো জমিদারের কার্য-ভার গ্রহণ করিল।

এক্ষণে রাসমণির অবস্থা পূর্বের ঠিক বিপরীত। এখন

রাসমণির স্বামীর অন্নেই শশিভূষণ ও ব্রজসুন্দরী প্রতিপালিত। সে কথা লইয়া সে স্পষ্ট কোনো গর্ব করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু কোনো একদিন বোধ করি আভাসে ইঙ্গিতে ব্যবহারে সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল ; বোধ করি দেমাকের সহিত পা ফেলিয়া এবং হাত দুলাইয়া কোনো-একটা বিষয়ে বড়োগিন্নির ইচ্ছার প্রতিকূলে নিজের মনোমত কাজ করিয়াছিল—কিন্তু সে কেবল একটি দিন মাত্র, তাহার পরদিন হইতে সে যেন পূর্বের অপেক্ষাও নম্র হইয়া গেল। কারণ, কথাটা তাহার স্বামীর কানে গিয়াছিল : এবং রাত্রে রাধামুকুন্দ কী কী যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল ঠিক বলিতে পারি না, পরদিন হইতে তাহার মুখে আর রা রহিল না, সে বড়োগিন্নির দাসীর মতো হইয়া রহিল। শুনা যায়, রাধামুকুন্দ সেই রাত্রেই স্ত্রীকে তাহার পিতৃভবনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল এবং সপ্তাহকাল তাহার মুখদর্শন করে নাই। অবশেষে ব্রজসুন্দরী ঠাকুরপোর হাতে ধরিয়া অনেক মিনতি করিয়া দম্পতীর মিলনসাধন করাইয়া দেন ; এবং বলেন "ছোটবউ তো সেদিন আসিয়াছে, আর আমি কতকাল হইতে তোমাদের ঘরে আছি, ভাই! তোমাতে আমাতে যে চিরকালের প্রিয়সম্পর্ক তাহার মর্যাদা ও কি বুঝিতে শিখিয়াছে। ও ছেলেমানুষ উহাকে মাপ করো।"

রাধামুকুন্দ সংসার-খরচের সমস্ত টাকা ব্রজসুন্দরীর হাতে আনিয়া দিতেন। রাসমণি নিজের আবশ্যক ব্যয় নিয়ম অনুসারে অথবা প্রার্থনা করিয়া ব্রজসুন্দরীর নিকট হইতে পাইতেন। গৃহ-মধ্যে বড়োগিন্নীর অবস্থা পূর্বাপেক্ষা ভালো বৈ মন্দ নহে, কারণ পূর্বে বলিয়াছি, শশিভূষণ স্নেহবশে এবং নানা বিবেচনায় রাসমণিকে বরঞ্চ অনেক সময় অধিক পক্ষপাত দেখাইতেন।

শশিভূষণের মুখে যদিও তাঁহার সহজ প্রফুল্ল হাস্যের বিরাম ছিল না, কিন্তু গোপন অসুখে তিনি প্রতিদিন কৃশ হইয়া যাইতেছিলেন। আর কেহ তাহা ততটা লক্ষ্য করে নাই, কেবল দাদার মুখ দেখিয়া রাধার চক্ষে নিদ্রা ছিল না। অনেক সময় গভীর

রাত্রে রাসমণি জাগ্রত হইয়া দেখিত, গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অশান্তভাবে রাধা এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে।

রাধামুকুন্দ অনেক সময় শশিভূষণকে গিয়া আশ্বাস দিত, "তোমার কোনো ভাবনা নাই, দাদা। তোমার পৈতৃক বিষয় আমি ফিরাইয়া আনিব—কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না। বেশিদিন দেরিও নাই।"

বাস্তবিক বেশিদিন দেরিও হইল না। শশিভূষণের সম্পত্তি যে ব্যক্তি নিলামে খরিদ করিয়াছিল সে ব্যবসায়ী লোক, জমিদারির কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সম্মানের প্রত্যাশায় কিনিয়াছিল, কিন্তু ঘর হইতে সদর-খাজনা দিতে হইত—এক পয়সা মুনাফা হইত না। রাধামুকুন্দ বৎসরের মধ্যে দু-একবার লাঠিয়াল লইয়া লুটপাট করিয়া খাজনা আদায় করিয়া আনিত। প্রজারাও তাহার বাধ্য ছিল। অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতীয় ব্যবসায়জীবী জমিদারকে তাহারা মনে মনে ঘৃণা করিত এবং রাধামুকুন্দের পরামর্শে ও সাহায্যে সর্বপ্রকারেই তাহার বিরুদ্ধাচারণ করিতে লাগিল।

অবশেষে সে বেচারা বিস্তর মকদ্দমা-মামলা করিয়া, ব্যবসায় অকৃতকার্য হইয়া এই ঝঞ্ঝাট হাত হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। সামান্য মূল্যে রাধামুকুন্দ সেই পূর্বসম্পত্তি পুনর্বার কিনিয়া লইলেন।

লেখায় যত অল্পদিন মনে হইল আসলে ততটা নয়। ইতিমধ্যে প্রায় দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দশ বৎসর পূর্বে শশিভূষণ যৌবনের সর্বপ্রান্তে পৌঢ় বয়সের আরম্ভভাগে ছিলেন। কিন্তু এই আট দশ বৎসরের মধ্যেই তিনি অন্তররুদ্ধ মানসিক উত্তাপের বাষ্প-যানে চড়িয়া একেবারে সবেগে বার্ধক্যের মাঝখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি যখন ফিরিয়া পাইলেন তখন, কী জানি কেন, আর তেমন প্রফুল্ল হইতে পারিলেন না। বহুদিন অব্যবহারে হৃদয়ের বীণাযন্ত্র বোধ করি বিকল হইয়া গিয়াছে, এখন সহস্রবার তার টানিয়া বাঁধিলেও ঢিলা হইয়া নামিয়া যায়—সে সুর আর কিছুতেই বাহির হয় না।

গ্রামের লোকেরা বিস্তর আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহারা একটা ভোজের জন্য শশিভূষণকে গিয়া ধরিল। শশিভূষণ রাধামুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী বল ভাই ?"

রাধামুকুন্দ বলিলেন, "অবশ্য শুভদিনে আনন্দ করিতে হইবে বৈকি।"

গ্রামে এমন ভোজ বহুকাল হয় নাই। গ্রামের ছোটো বড়ো সকলেই খাইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা এবং দুঃখী-কাঙালগণ পয়সা ও কাপড় পাইয়া আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

শীতের আরম্ভে গ্রামে তখন সময়টা খারাপ ছিল; তাহার উপরে শশিভূষণ পরিবেশনাদি বিবিধ কার্যে তিন-চারদিন বিস্তর পরিশ্রম এবং অনিয়ম করিয়াছিলেন। তাঁহার ভগ্ন শরীরে আর সহিল না—তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য দুরূহ উপসর্গের সহিত কম্প দিয়া জ্বর আসিল। বৈদ্য মাথা নাড়িয়া কহিল, "বড়ো শক্ত ব্যাধি।"

রাত্রি দুই-তিন প্রহরের সময় রোগীর ঘর হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিয়া রাধামুকুন্দ কহিলেন, "দাদা, তোমার অবর্তমানে বিষয়ের অংশ কাহাকে কিরূপ দিব সেই উপদেশ দিয়া যাও।"

শশিভূষণ কহিলেন, "ভাই আমার কী আছে যে কাহাকে দিব ?"

রাধামুকুন্দ কহিলেন, "সবই তো তোমার।"

শশিভূষণ উত্তর দিলেন, "এক কালে আমার ছিল, এখন আমার নহে।"

রাধামুকুন্দ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া শয্যার এক অংশের চাদর দুই হাত দিয়া বার বার সমান করিয়া দিতে লাগিল। শশিভূষণের শ্বাসক্রিয়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল।

রাধামুকুন্দ তখন শয্যাপ্রান্তে উঠিয়া বসিয়া রোগীর পা ধরিয়া কহিলেন, "দাদা, আমি যে মহাপাতকের কাজ করিয়াছি তাহা তোমাকে বলি, আর তো সময় নাই।"

শশিভূষণ কোনো উত্তর করিলেন না। রাধামুকুন্দ বলিয়া

গেলেন—সেই স্বাভাবিক শান্ত ভাব এবং ধীরে ধীরে কথা, কেবল মাঝে মাঝে এক-একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠিতে লাগিল—"দাদা আমার ভালো করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। মনের যথার্থ যে ভাব সে অন্তর্যামী জানেন, আর পৃথিবীতে যদি কেহ বুঝিতে পারে তো হয়তো তুমি পারিবে। বালক-কাল হইতে তোমাতে আমাতে অন্তরে-প্রভেদ ছিল না, কেবল বাহিরে প্রভেদ। কেবল এক প্রভেদ ছিল—তুমি ধনী, আমি দরিদ্র। যখন দেখিলাম, এই সামান্য সূত্রে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে; তখন আমিই সে প্রভেদ লোপ করিয়াছিলাম। আমি সদর খাজনা লুট করাইয়া তোমার সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছিলাম।"

শশিভূষণ তিলমাত্র বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে রুদ্ধ উচ্চারণে কহিলেন, "ভাই, ভালোই করিয়াছিলে। কিন্তু যেজন্য এত করিলে তাহা কি সিদ্ধ হইল? কাছে কি রাখিতে পারিলে? দয়াময় হরি!" বলিয়া প্রশান্ত মৃদুহাস্যের উপরে দুই চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রাধামুকুন্দ তাঁহার দুই পায়ের নীচে মাথা রাখিয়া কহিল, "দাদা, মাপ করিলে তো?"

শশিভূষণ তাহাকে কাছে ডাকিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "ভাই তবে শোনো। একথা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম। তুমি যাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে তাহারাই আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। আমি তখন হইতে তোমাকে মাপ করিয়াছি।"

রাধামুকুন্দ দুই করতলে লজ্জিত মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে কহিল, "দাদা, মাপ যদি করিয়াছ তবে এই সম্পত্তি তুমি গ্রহণ করো। রাগ করিয়া ফিরাইয়া দিয়ো না।

শশিভূষণ উত্তর দিতে পারিলেন না—তখন তাঁহার বাকরোধ হইতেছে—রাধামুকুন্দের মুখের দিকে অনিমেষ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া একবার দক্ষিণ হস্ত তুলিলেন। তাহাতে কী বুঝাইল বলিতে পারি না, বোধ করি রাধামুকুন্দ বুঝিয়া থাকিবে।

[সংক্ষেপিত]



লালু

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[লেখক-পরিচিতি ঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—জন্ম ১৮৭৬, ১৫ই সেপ্টেম্বর; মৃত্যু ১৯৩৭, ৬ই জানুয়ারী। জন্মস্থান হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে। ভাগলপুরে মামার বাড়ীতে তিনি প্রতিপালিত হন। প্রথম জীবনে ইনি বার্মাতে চাকরি করতেন। পরে সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। হাওড়া জেলার পানিত্রাসে শেষ জীবনের দিকে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। এঁর প্রথম গল্প মন্দির। বড়দিদি, বিরাজ বৌ, পণ্ডিতমশাই, পল্লীসমাজ, শ্রীকান্ত, চন্দ্রনাথ, দেবদাস, চরিত্রহীন, পথের দাবি, শেষ প্রশ্ন, নিষ্কৃতি, অরক্ষণীয়া প্রভৃতি উপন্যাস গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। নারীর মূল্য তাঁর রচিত প্রবন্ধ পুস্তক।]

তার ডাকনাম ছিল লালু। ভাল নাম অবশ্য একটা ছিলই, কিন্তু মনে নেই। জান বোধ হয়, হিন্দীতে 'লাল' শব্দটার অর্থ হচ্ছে—প্রিয়। এ নাম কে তার দিয়েছিল জানিনে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে নামের এমন সঙ্গতি কদাচিৎ মেলে। সে ছিল সকলের প্রিয়।

ইস্কুল ছেড়ে আমরা গিয়ে কলেজে ভর্তি হলাম, লালু বললে সে ব্যবসা করবে। মায়ের কাছে দশ টাকা চেয়ে নিয়ে সে ঠিকেদারি শুরু করে দিলে। আমরা বললাম,—লালু, তোমার পুঁজি তো দশ টাকা। সে হেসে বলল,—আর কত চাই, এই তো ঢের।

সবাই তাকে ভালোবাসতো, তার কাজ জুটে গেল। তারপর কলেজের পথে প্রায়ই দেখতে পেতাম, লালু ছাতামাথায় জনকয়েক কুলি-মজুর নিয়ে রাস্তার ছোটখাটো মেরামতির কাজে লেগেচে।

আমাদের দেখে হেসে তামাসা করে বলত—যা যা, দৌড়ো—পার্সেণ্টেজ-এর খাতায় এখুনি ঢ্যাঁড়া পড়ে যাবে।

তারও ছোটকালে আমরা যখন বাঙলা ইস্কুলে পড়তাম, তখন সে ছিল সকলের মিস্ত্রী। তার বইয়ের থলির মধ্যে সর্বদাই মজুত থাকত একটা হামান্‌দিস্তার ডাঁটি, একটা নরুন, একটা ভাঙ্গা ছুরি, ফুটো করবার একটা পুরোনো তুরপুনের ফলা, একটা ঘোড়ার নাল—কি জানি কোথা থেকে সে এসব সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু এ দিয়ে না পারতো সে এমন কাজ নেই। ইস্কুল সুদ্ধ সকলের ভাঙা ছাতা সারানো, স্লেটের ফ্রেম আঁটা, খেলতে খেলতে ছিঁড়ে গেলে তখনি জামা-কাপড় সেলাই করে দেওয়া—এমন কত কি! কোন কাজে কখনো 'না' বলতো না সে। আর করতোও চমৎকার। একবার 'ছট্‌' পরবের দিনে কয়েক পয়সার রঙিন কাগজ আর শোলা কিনে কি একটা নতুন জিনিস তৈরি করে সে গঙ্গার ঘাটে বসে প্রায় আড়াই টাকার খেলনা বিক্রি করে ফেলল। তার থেকে আমাদের পেট ভরে চিনেবাদামভাজা খাইয়ে দিলে।

বছরের পর বছর যায়, সকলে বড় হয়ে উঠলাম। জিম্‌নাস্টিকের আখড়ায় লালুর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তার গায়ে জোর ছিল যেমন অসাধারণ, সাহস ছিল তেমনি অপরিসীম। ভয় কাকে বলে সে বোধকরি জানতো না। সকলের ডাকেই সে প্রস্তুত, সবার বিপদে সে সকলের আগে এসে উপস্থিত। কেবল তার একটা মারাত্মক দোষ ছিল, কাউকে ভয় দেখাবার সুযোগ পেলে সে কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারতো না। এতে ছেলে-বুড়ো গুরুজন সবাই তার কাছে সমান। আমরা কেউ ভেবে পেতাম না, ভয় দেখাবার এমন সব অদ্ভুত ফন্দি তার মাথায় একনিমেষে কোথা থেকে আসে! ......একটা ঘটনা বলি। পাড়ার মোহন চাটুজ্জের বাড়িতে কালীপুজো। দুপুর রাতে বলির ক্ষণ বয়ে যায়, কিন্তু কামার অনুপস্থিত। লোক ছুটলো ধরে আনতে, কিন্তু গিয়ে দেখে সে পেটের ব্যথায় অচেতন। ফিরে এসে সংবাদ দিতেই সবাই মাথায়

হাত দিয়ে বসলো—উপায় ? এত রাতে ঘাতক মিলবে কোথায় ? দেবীর পুজো পণ্ড হয়ে যায় যে ! কে একজন বলল—পাঁঠা কাটতে পারে লালু। এমন অনেক সে কেটেছে। লোক দৌড়লো তার কাছে। লালু ঘুম থেকে উঠে বসলো, বললে—না।

—না কি গো ? দেবীর পুজোর ব্যাঘাত ঘটলে সর্বনাশ হবে যে !

লালু বললে,—হয় হোক্ গে। ছোটবেলায় ওকাজ করেচি, কিন্তু এখন আর করব না।

যারা ডাকতে এসেছিল তারা মাথা কুটতে লাগল, আর দশ-পনেরো মিনিট মাত্র সময়, তারপর সব নষ্ট, সব শেষ ! তখন মহাকালীর কোপে কেউ বাঁচবে না। লালুর বাবা এসে আদেশ দিলেন যেতে। বললেন—'ওঁরা নিরুপায় হয়েই এসেছেন না গেলে অন্যায় হবে। তুমি যাও।' সে আদেশ অমান্য করার সাধ্য লালুর নেই।

লালুকে পেয়ে চাটুজ্জেমশায়ের ভাবনা ঘুচলো। সময় নেই—তাড়াতাড়ি পাঁঠা উৎসর্গিত হয়ে কপালে সিঁদুর, গলায় জবার মালা পরে হাড়িকাঠে পড়লো, বাড়িসুদ্ধ লোকের 'মা', 'মা' রবের প্রচণ্ড চিৎকারে নিরুপায় নিরীহ জীবের শেষ আর্তকণ্ঠ কোথায় ডুবে গেল। লালুর হাতের খড়গ নিমেষে ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়েই সজোরে নামল, তারপর বলির ছিন্নকণ্ঠ থেকে রক্তের ফোয়ারা কালো মাটি রাঙা করে দিলে। লালু ক্ষণকাল চোখ বুজে রইলো। ঢাক-ঢোল কাসির সংমিশ্রণে বলির বিরাট বাজনা থেমে এলো। ক্রমশঃ যে পাঁঠাটা অদূরে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল, আবার তার কপালে চড়ালো সিঁদুর, গলায় দুললো রাঙা মালা, আবার সেই হাড়িকাঠ, সেই ভয়ংকর অন্তিম আবেদন, সেই বহুকণ্ঠের সম্মিলিত 'মা', 'মা' ধ্বনি। আবার লালুর রক্তমাখা খাঁড়া উপরে উঠে চক্ষের পলকে নিচে নেমে এলো,—পশুর দ্বিখণ্ডিত দেহটা ভূমিতলে বারকয়েক হাত-পা আছড়ে কি জানি কাকে শেষ নালিশ জানিয়ে স্থির হলো। তার কাটা গলার রক্তধারা রাঙামাটি আরো খানিকটা রাঙিয়ে দিলো।

ঢুলিরা উন্মাদের মত ঢোল বাজাচ্ছে, উঠানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে বহু লোকের বহু প্রকারের কোলাহল, সুমুখের বারান্দায় কার্পেটের আসনে বসে মনোহর চাটুজ্জে মুদ্রিত নেত্রে ইষ্টনাম জপে রত। অকস্মাৎ লালু ভয়ংকর একটা হুংকার দিয়ে উঠলো। সমস্ত সাড়া-শব্দ গেল থেমে—সবাই বিস্ময়ে স্তব্ধ—এ আবার কি! লালুর অসম্ভব বিস্ফারিত চোখের তারা দুটো যেন ঘুরচে, চেঁচিয়ে বললে,—পাঁঠা কই?

বাড়ির কে একজন ভয়ে জবাব দিলে,—আর পাঁঠা নেই। আমাদের শুধু দুটো করেই বলি হয়।

লালু তার হাতের রক্তমাখা খাঁড়াটা উপরে বার দুই ঘুরিয়ে ভীষণ কর্কশ কণ্ঠে গর্জন করে উঠলো,—নেই পাঁঠা, সে হবে না। আমার খুন চেপে গেছে—দাও পাঁঠা, নইলে আজ আমি যাকে পাব ধরে নরবলি দেব—মা, মা জয়কালী!—বলেই একটা মস্ত লাফ দিয়ে সে হাড়িকাঠের এদিক থেকে ওদিক গিয়ে পড়লো। তার হাতের খাঁড়া তখন বনবন করে ঘুরচে। তখন যে কাণ্ড ঘটলো, ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সবাই একসঙ্গে ছুটল সদর দরজার দিকে, পাছে লালু ধরে ফেলে। পালাবার চেষ্টায় বিষম ঠেলাঠেলি হুড়োমুড়িতে সেখানে দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার বেধে গেল। কেউ পড়ছে গড়িয়ে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে কারো পায়ের ফাঁকের মধ্যে মাথা গলিয়ে বেরোবার চেষ্টা করচে, কারো গলা কারো বগলের চাপের মধ্যে পড়ে দম আটকাবার মত হয়েছে। একজন আরেকজনের ঘাড়ের উপর দিয়ে পালাবার চেষ্টায় ভিড়ের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ছে। কিন্তু এসব মাত্র মুহূর্তের জন্য। তারপরই সমস্ত ফাঁকা।

লালু গর্জে উঠলো—মনোহর চাটুজ্জে কই? পুরুত গেল কোথায়?

পুরুত রোগা লোক, সে গণ্ডগোলের সুযোগে আগেই গিয়ে লুকিয়েছে প্রতিমার আড়ালে। গুরুদেব কুশাসনে বসে চণ্ডীপাঠ করছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে ঠাকুরদালানের একটা মোটা থামের

পিছনে গা-ঢাকা দিয়েছেন। কিন্তু বিপুলায়তন দেহ নিয়ে মনোহরের পক্ষে ছুটাছুটি করা কঠিন। লাল্‌ু এগিয়ে বাঁ-হাতে তাঁর একটা হাত চেপে ধরে বললে,—চলো হাড়িকাঠে গিয়ে গলা দেবে।

একে তার বজ্রমুষ্টি, তাতে ডান হাতে খাঁড়া, ভয়ে চাটুজ্জের প্রাণ উড়ে গেল। কাঁদো-কাঁদো গলায় মিনতি করতে লাগলেন,—লাল্‌ু! বাবা, স্থির হয়ে চেয়ে দেখ—আমি পাঁঠা নই, মানুষ। আমি সম্পর্কে তোমার জ্যাঠামশাই হই বাবা, তোমার বাবা আমার ছোট ভাইয়ের মত।

—সে জানিনে। আমার খুন চেপেছে—চলো, তোমাকে বলি দেব। মায়ের আদেশ!

চাটুজ্জে ডুকরে কেঁদে উঠলেন,—না বাবা, মায়ের আদেশ নয়, কক্ষনো নয়—মা যে জগৎ-জননী।

লাল্‌ু বললে,—জগৎ-জননী! সে জ্ঞান আছে তোমার? আর দেবে পাঁঠাবলি? ডেকে পাঠাবে আমাকে পাঁঠা কাটতে? বলো?

চাটুজ্জে কাঁদতে কাঁদতে বললেন,—কোনদিন নয় বাবা, কোনদিন নয়। মায়ের সুমুখে তিন সত্যি করছি—আজ থেকে আমার বাড়িতে বলি বন্ধ।

—ঠিক তো!

—ঠিক বাবা, ঠিক। আর কখনও না। আমার হাতটা ছেড়ে দাও বাবা, একবার পায়খানায় যাব।

লাল্‌ু হাত ছেড়ে দিয়ে বললে,—আচ্ছা যাও, তোমাকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু পুরুত পালালো কোথা দিয়ে? গুরুদেব? সে কই?—এই বলে সে পুনশ্চ একটা হুংকার দিয়ে লাফ মেরে ঠাকুর-দালানের দিকে অগ্রসর হতেই প্রতিমার পিছন ও থামের আড়াল হতে দুই বিভিন্ন গলায় ভয়ার্ত ক্রন্দন উঠলো। সরু-মোটায় মিলিয়ে সে শব্দ এমন অদ্ভুত ও হাস্যকর যে লাল্‌ু নিজেকে আর সামলাতে পারলে না। 'হাঃ হাঃ হাঃ' করে হেসে উঠে দুম করে মাটিতে খাঁড়াটা ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে বাড়ি ছেড়ে পালালো।



ফার্ষ্টক্লাশ ভূত

প্রমথ চৌধুরী

[লেখক-পরিচিতিঃ বাংলা ভাষায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী অর্থাৎ বীরবলের একটা নিজস্ব স্থান আছে। রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম লেখক ছিলেন তিনি। কি গল্পে, কি হাস্যরস বা প্রবন্ধে তাঁর স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করবার। তাঁর সম্পাদিত সবুজপত্র পত্রিকা সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা ছিল। প্রথম চৌধুরী শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর গল্প উপন্যাসের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও তিনি যে কটি গল্প বা উপন্যাস লিখেছেন তা নিজস্ব স্টাইলে ও ভঙ্গীমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আলোচ্য গল্পটি তাঁর 'বীরবলের গল্প' থেকে সংকলিত, এই গল্পে তিনি সবজান্তার একটা আশ্চর্য চরিত্র এঁকেছেন।]

আমরা তখন সবে কলকাতায় এসেছি, ইস্কুলে পড়তে। কলকাতার ইস্কুল যে মফঃস্বলের চাইতে ভাল সে বিশ্বাসে নয়। কারণ, ইস্কুল সব জায়গাতেই সমান। সবই এক ছাঁচে ঢালা। আমরা এসেছিলুম ম্যালেরিয়ার হাত থেকে উদ্ধার পেতে।

আমরা আসবার মাসতিনেক পরে হঠাৎ সারদা দাদা এসে আমাদের অতিথি হলেন। সারদা দাদা কি হিসাবে আমাদের দাদা হতেন, তা আমি জানিনে। তিনি আমাদের জ্ঞাতি নন, কুটুম্বও নন, গ্রাম সম্বন্ধে ভাইও নন। তাঁর বাড়ী আমাদের গ্রামে নয়। দেশ তাঁর যেখানেই হোক, সেখানে তাঁর বাড়ী ছিল না। তিনি সংসারে ভেসে বেড়াতেন। আমাদের অঞ্চলে সেকালে উইয়ের ঢিবির মতো দেদার জমিদারবাবু ছিলেন, আর তাঁদের সঙ্গে তাঁর একটা-না-একটা সম্পর্ক

ছিল। সে সম্পর্ক যে কি তাও কেউ জানত না ; কিন্তু এর ওর বাড়ীতে অতিথি হয়েই তিনি জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। আর সব জায়গাতেই তিনি আদরযত্ন পেতেন। তিনি একে ব্রাহ্মণ, তার উপর কথাবার্তায় ও ব্যবহারে ছিলেন ভদ্রলোক। তাই তিনি দাদা হোন, মামা হোন, দূর সম্পর্কের শালা হোন, ভগ্নীপতি হোন সকলেই তাঁকে অতিথি করতে প্রস্তুত ছিলেন। টাকা তিনি কারও কাছে চাইতেন না। তাঁর নাকি কাশীতে একটি বিধবা আত্মীয়া ছিলেন, আবশ্যক হলে তাঁর কাছ থেকেই টাকা পেতেন। সে মহিলাটির নাম সুখদা। সুখদার নাকি ঢের টাকা ছিল, সন্তানাদি কিছু ছিল না। তাই সুখদার আপনার লোক বলে তাঁর মানও ছিল।

সারদা দাদার আগমনে আমরা ছেলেরা খুশি হলুম, যদিও ইতিপূর্বে তাঁকে কখনও দেখিনি, তাঁর নাম শুনিনি। আমাদের মনে হল তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে বাঁচব। কলকাতায় আমাদের কোন আত্মীয়স্বজনও ছিল না, কোন বন্ধুবান্ধবও ছিল না, যার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে সময় কাটান যায়। আর ইস্কুলের সহপাঠিদের সঙ্গে গল্প করেও চমৎকৃত হতুম না, কারণ সেকালে কলকাতাই ছেলেদের কথাবার্তার রস কলকাতার দুধের মতোই ছিল নেহাৎ জলো।

সারদা দাদা রোজ সন্ধ্যাবেলায় আমাদের দেদার গল্প বলতেন ; জীবনে যা তিনি দেখতেন, তারই গল্প। মা অবশ্য আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, সারদা যা বলে তার ষোল আনাই মিথ্যা। কিন্তু আমরা তাতে ভড়কাইনি।

কেন না, মিথ্যা কথা আদালতে চলে না, কিন্তু গল্পে দিবারাত্র চলে। সে যাই হোক, সারদা দাদা বেশীর ভাগ ভূতের গল্প বলতেন। তবে সে কথা মার কাছে ফাঁস করিনি। শুনেছি বাবার একজন প্রিয় তামাকওয়ালা দাদার কাছে নিত্য ভূতের গল্প বলত, ফলে দাদা নাকি রাত্তিরে এ-ঘর থেকে ও-ঘর যেতে ভয় পেতেন। তারপর বাবা তাঁর প্রিয় তামাকওয়ালার আমাদের বাড়ী আসা বন্ধ

করে দিলেন। পাছে মা সারদা দাদাকে বিদায় করে দেন, এই ভয়ে মার কাছে এ গল্প সাহিত্যের আর পুনরাবৃত্তি করতুম না। তা ছাড়া, কলকাতা শহরে তো ভূতের ভয় নেই। রাস্তায় আলো, পথের ধারে শুধু বাড়ি, জঙ্গল নেই। ভূতেরা আলোকে ভয় করে ও মানুষের চেঁচামেচিকে। কলকাতায় আলো যতটা না থাকে, হল্লা দেদার আছে। আর হট্টগোলের মধ্যে ভূত আসে না। সারদা দাদা শুধু সেই সব ভূতের গল্প বলতেন যাদের তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। আমি তাকে একদিন জিজ্ঞেস করলুম—আপনি তো শুধু পাড়া-গেঁয়ে ভূতের গল্প করেন, আপনি কি কখনো সাহেব ভূত দেখেন নি?

সারদা দাদা উত্তর করলেন—দেখব কোত্থেকে? সাহেবরা তো এদেশে মরে না। না মরলে তারা ভূত হবে কি করে? দেখো, ট্রেনে এত বড় বড় কলিশন হয়, যাতে হাজার হাজার দেশী লোক মরে; কিন্তু তাতে কোন সাহেব মরেছে, এমন কথা কি কখনো শুনেছ?

—তবে এত গোরস্হানে কারা পোঁতা আছে?

—সব ফিরিঙ্গি। তবে দু-চারজন সাহেব যে মরে না এমন কথা বলছি নে। কিন্তু যারা মরে ভূত হয়, তাদের আমরা দেখা পাই নে।

—কেন?

এদেশে তারা গাছেও থাকে না, পায়ে হেঁটেও বেড়ায় না। তারা ট্রেনের ফার্স্টক্লাশ গাড়িতে চড়ে বেড়ায় আর ফিরিঙ্গি ভূতেরা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িতে। তবে একবার একজনের দেখা পেয়েছিলুম। আর তার হাতে যে সাজা-শাস্তি পেয়েছিলুম, তা আর বলবার কথা নয়। আজও মনে হলে কান্না পায়!

—আমরা সেই সাহেব ভূতের গল্প শুনতে চাই।

সারদা দাদা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আচ্ছা, বলছি শোনো। কিন্তু এ গল্প যেন আর কাউকে বলো না।

—কেন?

—কি, জানি, আবার যদি মানহানির মামলায় পড়ে যাই। মরা

লোকেরও মানহানি করলে জরিমানা হয়, জেলও হয়। আবার জেল খাটতে আমার ইচ্ছে নেই। এরপর সারদা দাদা বললেন—

আমি একবার কলকাতা থেকে কাশী যাচ্ছিলুম। হাওড়া স্টেশনে যখন পেঁছিলুম তখন গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে। তাই একটা খালি ফার্স্ট ক্লাশ গাড়িতে উঠে পড়লুম এই মনে করে যে, পরের স্টেশনে নেমে থার্ড ক্লাশে ঢুকব। গাড়ী তো ছাড়ল, অমনি বাথরুম থেকে একটি সাহেব বেরিয়ে এল। ঝাড়া সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, মুখ রক্তবর্ণ, চোখ গুলির মত। আর তার সর্বাঙ্গে বেজায় মদের গন্ধ বেরুচ্ছে, আর সে বিলেতী মদের। সে ঘরে ঢুকেই বললে,—'কালা আদমী, নিচু যাও।' আমার তখন ভয়ে নাড়ী ছেড়ে দিয়েছে, আমি কাঁপতে কাঁপতে বললুম—হুজুর, আভি কিস্তরে নীচু যায়েগা! দুসরা স্টেশন মে উতার যায়েঙ্গে। তিনি বললেন—'ও নেহি হো শকতা। তোমরা কাপড়া বহুত ময়লা, আর তোমার দেহ সে বহুত বদ বু। গোসলখানাসে যাকে তোমরা কাপড়া উতার কে গোসল করো। আর হুঁই বৈঠ রহো। হাম চলা যানেসে তুম গোসলখানাসে নিকলিয়ে। হাম যো বলতা আভি করো, জানতা হাম রেলকো বড়াসাহেব হ্যায় ?'

আমি প্রাণের দায়ে হুজুর যা বললেন তাই করলুম। অর্থাৎ স্নানের ঘরে গিয়ে বিবস্ত্র হয়ে সেই শীতের রাত্তিরে স্নান করলুম। অমনি একটা দমকা হাওয়া এসে আমার কাপড়চোপড় উড়িয়ে কোথায় নিয়ে গেল। আমি বিবস্ত্র হয়ে ভিজে গায়ে গোসলখানাতেই বসে রইলুম। আর সাহেব তাঁর কামরায় হুটোপাটি করতে লাগলেন ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার করে আমার প্রতি শুয়োর, গাধা, উল্লুক, প্রভৃতি প্রিয় সম্ভাষণ করতে লাগলেন। আমি নীরবে সব গালিগালাজ হজম করলুম। [সংক্ষিপ্ত]



রাজভোগ

রাজশেখর বসু

[লেখক-পরিচিতি : রাজশেখর বসু ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রসায়ন শাস্ত্রে এম.এ. ও আইন পরীক্ষা দেন। কর্মজীবনে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিচালনা করতেন। সাহিত্য জগতে 'পরশুরাম এই ছদ্মনামে তিনি যুগান্তর আনেন। গড্ডালিকা, কজ্জলী, তাঁর প্রসিদ্ধ হাস্যরসের গল্প। বাংলা বানান সংস্কারে তিনি অগ্রণী ছিলেন। 'চলন্তিকা' নামে একটি প্রয়োজনীয় অভিধান প্রণয়ন করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তিনি জগত্তারিণী, সরোজিনী পদক লাভ করেন। ডি. লিট. উপাধি পান। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত (পদ্মশ্রী) খেতাব পান। তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান অসামান্য ও বাংলা রস সাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম পথ প্রদর্শক। তিনি ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁর এই গল্পটি পরশুরামের গল্প সংগ্রহ থেকে সংকলিত করা হয়েছে।]

পৌষ মাস, সন্ধ্যাবেলা। একটি প্রকাণ্ড মোটর অ্যাংলো-মোগলাই হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। মোটরটি সেকেলে, কিন্তু দামী। চালকের পাশ থেকে একজন চোপদার জাতীয় লোক নেমে পড়ল।

লোকটি তার প্রকাণ্ড গোঁফে তা দিতে দিতে সগর্বে হোটেলে ঢুকে ম্যানেজারকে বললে, 'পাতিপুকুরকা রাজবাবাহাদুর আয়ে হেঁ।'

ম্যানেজার রাইচরণ চক্রবর্তী শশব্যস্তে বেরিয়ে এল এবং মোটরের দরজার সামনে হাতজোড় করে নতশিরে বললে, মহারাজ

আজ কার মুখ দেখে উঠেছি। দয়া করে নেমে এই গরীবের কুটিরে পায়ের ধুলো দিতে আজ্ঞা হউক।

পাতিপুকুরের রাজাবাহাদুর ধীরে ধীরে মোটর থেকে নামলেন। তাঁর বয়স সত্তর বছর পেরিয়েছে, দেহ আর পাকা-গোঁফজোড়াটি খুবই শীর্ণ, মাথায় যেটুকু চুল বাকি আছে, তাই দিয়ে টাক ঢেকে সিঁথি কাটবার চেষ্টা করেছেন। পরনে জরিপাড় ধুতি আর রেশমী পাঞ্জাবি, তার উপর দামী শাল, পায়ে শুঁড়ওয়ালা লাল লপেটা। রাইচরণ কুঁজো হয়ে সামনের দিকে বিনয়ে জোড়হাত নাড়তে নাড়তে পথ দেখিয়ে রাজাবাহাদুরকে ভিতরে নিয়ে গেল, এবং হেঁকে বলল, এই শীগ্‌গির রয়েল সেলুনের দরজা খুলে দে। * * *

মহামান্য অতিথিকে বসিয়ে ম্যানেজার রাইচরণ বললে, হুজুর, আজ্ঞা করুন, কি এনে দেব। রাজাবাহাদুর সাগ্রহে বললেন, তোমার কি কি তৈরি আছে শুনি? রাইচরণ বললে, আজ্ঞে তিন রকম পোলাও আছে, ভেটকি মাছের, মটনের আর পাঁঠার। কালিয়া আছে, কোর্মা আছে, কোপ্তা আছে, মটন চপ, চিংড়ী কাটলেট, ফাউল রোস্ট, ছানার পুডিং—হুজুরের আশীর্বাদে আরও কত কি আছে!

রাজাবাহাদুর খুশী হয়ে বললেন, বেশ বেশ অতি উত্তম। আচ্ছা ম্যানেজার, তোমার এখানে বিরিয়ানি পোলাও হয়?

হয় বইকি হুজুর, ঘণ্টাখানেক আগে অর্ডার পেলেই করে দিতে পারি। আমি তিন বছর দুম্বাগড়ের নবাব সাহেবের রসুইঘরের সুপার-ইন্‌টেনডেণ্ট ছিলুম কিনা, সেখানেই সব শিখেছি। * * *

—থাক, থাক। আচ্ছা তোমার কায়দাটা কিরকম শুনি?

—বিরিয়ানি রান্নার? এক নম্বর বাসমতী চাল—এখন তার দাম পাঁচ টাকা সের, খাঁটি গাওয়া ঘি, ডুমো ডুমো মাংস, বাদাম, পেস্তা, কিশমিশ এবং হরেক রকম মসলা, গোলাপজলে গোলা খোয়া ক্ষীর, মৃগনাভি সিকি রতি, দশফোঁটা অডিকোলন, আলু একদম বাদ। চাল আর মাংস প্রায় সিদ্ধ হয়ে এলে তার উপর

দুমুঠো পেঁয়াজকুচি মুচমুচে করে ভেজে ছড়িয়ে দিই, তারপর দমে বসাই, খেতে যা হয় সে আর কি বলব !

রাজাবাহাদুরের জিভে জল এসে গেল, সুৎ করে টেনে নিয়ে বললেন, চমৎকার ! আচ্ছা সামি কাবাব জান ?

হেঁ হেঁ, হুজুরের আশীর্বাদে মোগলাই, ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, হেন রান্না নেই যা রাইচরণ চক্কত্তি জানে না। মাংস পিষে তার সঙ্গে ছোলার ডাল বাটা আর পেস্তাবাদাম মেশাতে হয়, তাতে আদা, হিং, পেঁয়াজ, রসুন, গরমমসলা ইত্যাদি পড়ে। তারপর চেপটা লেচি গড়ে চাটুতে ভাজতে হয়। এই হল সামি কাবাব। ওঃ খেতে যা হয় হুজুর, তা বলার কথা নয়।

রাজাবাহাদুর সুৎ করে জিভের জল টেনে নিলেন, তারপর বললেন - আচ্ছা রাইচরণ, রোগনজুস জান ?

—রোগনজুস হচ্ছে খাসি বা দুম্বার মাংস, শুধু ঘি-এ সিদ্ধ, জল একদম বাদ। ভারী পোষ্টাই হুজুর, সাতদিন খেলে লিকলিকে রোগা লোকের গায়ে গত্তি লেগে ভুঁড়ি গজায়।

—তুমি তো অনেক রকম জান দেখছি হে। আচ্ছা মুর্গমুসল্লম তৈরী করতে পার ?

— নিশ্চয় পারি হুজুর, ঘণ্টা তিনেক আগে অর্ডার দিতে হয়, অনেক লটঘটি কিনা। বাবুর্চিদের চেয়ে আমি ঢের ভাল বানাতে পারি ; আমি নতুন কায়দা আবিষ্কার করেছি। একটি বড় আস্ত মুরগি, তার পেটের মধ্যে মাছের কোপ্তা, ডিম আর কুঁচো চিংড়ি দেওয়া কচুর শাগের ঘণ্ট, অভাবে লাউ চিংড়ি আর দই—

—কচুর শাগ ? আরে রাম রাম !

—না হুজুর, মুরগির পেটে সমস্ত জিনিস ভরে দিয়ে সেলাই করে হাঁড়ি কাবাবের মতন পাক করতে হয়। সুসিদ্ধ হয়ে গেলে, মুরগি, কুঁচো চিংড়ি, কচুর শাগ, দই আর মসলা মিলে মিশে এক হয়ে যায়। খেতে যা হয়, সে আর বলব কি হুজুর !

রাজাবাহাদুর এবার আর সামলাতে পারলেন না, খানিকটা নাল

টেবিলে পড়ে গেল। একটু লজ্জিত হয়ে রুমাল দিয়ে মুছে ফেলে বললেন, ওহে রাইচরণ, উত্তম—সরভাজা খাওয়াতে পার?

—হুজুরের আশীর্বাদে কি না পারি! সরভাজার রাজা হল গোলাপী গাই-এর দুধের সরভাজা।

একটি ভাল গরুকে সাতদিন ধরে সেরেফ গোলাপ ফুল, গোলাপজল আর মিছরি খাওয়াতে হবে। খড়, ভূষি, জল একদম বারণ। তারপর সে যা দুধ দেবে তার রং হবে গোলাপী, তার খোসবায় ভুরভুর করবে। সেই দুধ ঘন করে তার সর নিতে হবে আর সেই দুধ থেকে তৈরী ঘি দিয়েই ভাজতে হবে। রসে ফেলবার দরকার নেই; আপনি মিষ্টি হবে, গরু মিছরি খেয়েছে কি না। এইবার হুজুর আজ্ঞা করুন কি কি খাবার আনব।***

আচ্ছা রাইচরণ, তোমার এখানে পাতি নেবু আছে?

—আছে বইকি, নেবু হল পোলাও খাবার অঙ্গ।

—সে হবে এখন। আচ্ছা রাইচরণ বার্লি রাখ?

—রাখি হুজুর। ছানার পুডিং-এ দিতে হয়, নইলে আঁট হয় না। এইবার তবে হুজুরের জন্য খাবার আনতে বলি?

—এক কাজ কর—এক কাপ জলে এক চামচ বার্লি সিদ্ধ করে নেবু আর একটু নুন দিয়ে নিয়ে এস।

রাইচরণ আকাশ থেকে পড়ে বলল, সে কি মহারাজ? ভেটকি মাছের পোলাও, মটনকারী, ফাউল রোস্ট—

রাজাবাহাদুর হঠাৎ অত্যন্ত খাপ্পা হয়ে বললেন, তুমি তো সাংঘাতিক লোক হ্যা। আমাকে মেরে ফেলতে চাও না কি, অ্যা? আমি বলে গিয়ে তিনটি বছর ডিসপেপ্‌সিয়া রোগে ভুগছি, হজম হয় না, সব বারণ। দিনে শুধু গলা ভাত আর শিঙি মাছের ঝোল, রাত্তিরে বার্লি—আমাকে পোলাও কালিয়ার লোভ দেখাচ্ছ! কি ভয়ানক খুনে লোক!

রাইচরণ মর্মাহত হয়ে চলে গেল এবং একটু পরে এক বাটি বার্লি এনে রাজাবাহাদুরের সামনে ঠক করে রেখে বললে, এই নিন।



[লেখক-পরিচিতি ঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জন্ম ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ ; মৃত্যু ১লা নভেম্বর ১৯৫০। পিতৃনিবাস ব্যারাকপুর, বনগ্রাম মহকুমা, উত্তর চব্বিশ পরগণা। বাল্যজীবন অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যেই অতিবাহিত হয়। পরের আশ্রয়ে থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেন এবং রিপন কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল শিক্ষকতা করবার পর ভাগলপুরের জমিদারী এস্টেটে চাকরি পেয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। বঙ্গ সাহিত্যে বিভূতিভূষণের দান অতুলনীয়। তিনি ছোট গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, দিনলিপি ও কিশোর সাহিত্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরণ্যক, ইছামতী, আদর্শ হিন্দু হোটেল, দেবযান, হীরে মানিক জ্বলে, হে অরণ্য কথা কও প্রভৃতি বিশিষ্ট গ্রন্থ।

আলোচ্য অংশটি বিভূতিভূষণের 'হে অরণ্য কথা কও' নামক ভ্রমণ কাহিনী থেকে গৃহীত।]

সকালে উঠে বনবিভাগের কর্মচারী মি. সিংহ আমাকে এক অপূর্ব সূর্যোদয় দেখালেন। সম্মুখের শৈলচূড়ার অন্তরাল থেকে বালসূর্য নিজের মহিমায় আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। আগে সমস্ত বড় বড় শিখরগুলোতে কে যেন সিন্দুর আর সোনার রেণু ছড়িয়ে দিলে। যে দিকে চাই সেই অজানা আকাশপুরীর অদৃশ্য হস্তের ইন্দ্রজাল। ধীরে ধীরে রোদ ফুটে বেরুলো, শৈলশিখরবাসী সামান্য কুয়াশা দিনের আলোর সামনে মিলিয়ে গেল—কি সুন্দর সুস্নিগ্ধ প্রভাত!

ঘুরে ঘুরে পাহাড়ী পথ—খানিকদূরে নেমে এসে রাস্তায়

উঠলাম আমরা চার পাঁচজন লোক ; দুজন বনবিভাগের উচ্চ কর্মচারী।

রাস্তার পাশে একটা সরু পায়ে-চলার পথ নিস্তব্ধ, ঈষৎ অন্ধকার ঘন বনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। একটি পাহাড়ী নালা বনের মধ্যে কুল্‌কুল্‌ করে বয়ে চলেছে। এই নালার নাম হচ্ছে হো পোগা-মারো-গাড়া। বনের মধ্যে ঢুকেই মনে হলো এতক্ষণ অরণ্যানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করি নি, যা দেখেছিলাম তা বাইরে থেকে। এ যেন একটা ভিন্ন জগৎ—সুউচ্চ সোজা খাড়া শাল, কেঁদ, বারম প্রভৃতি বনস্পতি শ্রেণীর ঘন সন্নিবেশ দিনের আলোক আটকেছে। সারাদিনের মধ্যে এখানে সূর্যের আলোক প্রবেশ করে কিনা সন্দেহ, সুতরাং বনভূমি ঈষৎ আর্দ্র, একটু বেশি শীতল, কাছে কাছে কত সুদর্শন অর্কিড, নিম্নে আগাছার জঙ্গলও বেশ ঘন।

এক জায়গায় ছোট-এলাচের গাছ হয়েছে, মি. সিংহ দেখালেন খুব বড় হলুদ গাছের মত পাতায় ছোট এলাচের গন্ধ। এদিক-ওদিক থেকে ক্ষীণ জলধারা আমাদের পথের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। তার ওপর প্রস্তর-সংকুল পথ, সুতরাং আমাদের যেতে হচ্ছিল খুব সন্তর্পণে।

ঘন অরণ্যশীর্ষে প্রভাতের সূর্যালোক, ক্বচিৎ কোন বনপুষ্প-সুবাস, এ বড় বনানীর একটা গভীর রহস্যের ভাব আমার মনে এনে দিয়েছে ; ভুলতে পারছি নে অরণ্যসমাকুল সিংভূমের যে অংশে বিচরণ করছি, এটি ব্যাঘ্র ও অন্যান্য শ্বাপদঅধ্যুষিত এক মহাবন ; ঠিক শৌখীন কোন পার্কে বেড়ানো নয় এটি—যে কোন সময়ে হস্তীযূথ বা মহাকায় ব্যাঘ্রের সামনে এসে পড়তে পারি, আমরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র—ফরেস্ট গার্ডের স্কন্ধস্থ কুড়ুল তখন কি কোনো কাজে আসবে ?

বেলা প্রায় দশটা। ঘড়ি দেখে সেটা বোঝা গেল বটে, কিন্তু এই বনের মধ্যে থেকে তা বোঝার জো নেই। রোদ্দুর পড়েনি মাটিতে বিশেষ কোথাও। ঘাস পাতা এখনও শিশিরার্দ্র।

আমি বললাম—আপনারা বাঘের ভয় করেন না ?

মি সিংহ বললেন—করলে আমাদের কাজ চলে না।

—বাঘের সামনে পড়েছেন কখনো ?

—দু-তিনবার। একবার মোটর ড্রাইভ করে ফিরছি পাটনা থেকে, গভীর রাতে কোডার্মার জঙ্গলে 'প্রকাণ্ড রয়েল-বেঙ্গল টাইগার' একেবারে গাড়ীর পাশে।

—পাশে ?

—হ্যাঁ, রাস্তার পাশে। একটা প্রকাণ্ড সম্বর হরিণ মেরে তাকে খাচ্ছে।

—আপনি কি করলেন ?

—কি আর করব! হেড লাইটের আলো পড়তে আমি ওটাকে দেখতে পেলাম, তারপর ভয় হল গাড়ীর ওপর লাফিয়ে না পড়ে।

মি. সিংহ বললেন—আমি আর একবার বুনো হাতীর পাল্লায় পড়েছিলাম। একটা পাহাড়ের ঢালু দিয়ে সাইকেলে নামছি, একদল বুনো হাতী বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে কান নাড়ছে। বাঘের চেয়ে বুনো হাতী বেশী বিপজ্জনক সোজা সাইকেল চালিয়ে দিলাম, পেছন দিকে আর চাইলাম না।

—এ বনে বাঘ আছে ?

—বড় বাঘ বিশেষ নেই। অন্য সব জানোয়ারই আছে। তবে বনকে বিশ্বাস নেই জানবেন।

পথের পাশে একটা বড় গাছের ছাল ওপর থেকে খুলে ঝুলে পড়েছে॥ সেটা দেখিয়ে মি. সিংহ বললেন, বলুন তো এরকম কেন হয়েছে ? আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম। বন্য হস্তীর দন্তাঘাতে বনস্পতির এই দশা। মি. সিংহ বললেন—টাটকা করেছে। এই দেখুন পায়ের দাগ। কাল রাতের ব্যাপার।

সত্যই বটে বেশ বোঝা গেল সন্ধ্যার পরে এসব পথে যাতায়াত করা সুবিধাজনক নয়।

এমন একটা জায়গায় এসেছি যেখানে রাস্তার পাশে অনেক নীচে একটা বনাবৃত উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ যে বনের মধ্যে আমরা বেড়াচ্ছি, সেটা যে অনেক উঁচু পাহাড়ের ওপরকার বন, নিম্নের উপত্যকা দেখে সেটা ভালোই বোঝা গেল। যেখানে আমরা ধূমপান ও বিশ্রামের জন্য বসলাম, সে স্থানটিকে বেমালুম আফ্রিকা বলে চালিয়ে দিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। এদিকে গভীর পাহাড়ী খাদ, অনেক নীচে অগণ্য বনস্পতির শীর্ষদেশ দেখা যাচ্ছে, দুপুরের রোদ এসে পড়েছে তাদের ওপরে।

বেলা পড়ে এসেছে। চারিধারের বনে এরই মধ্যে সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসবার উপক্রম করেছে। সুতরাং বেশীক্ষণ বাইরে থাকা ঠিক হবে না।

কয়েকটি হো মেয়ে পাহাড়ের নীচে ভাত রেঁধে খাচ্ছে। এরা সারাদিন জঙ্গলে কাজ করে, বাঘ ভাল্লুকের মুখে। সন্ধ্যাবেলায় নিজেদের আস্তানায় ফিরে দুটি নিরুপকরণ তণ্ডুল সিদ্ধ খেয়ে মহানন্দে দিন কাটায়। এতেই ওদের খুশি উপচে পড়ছে। আমরা ওদের কাছে কিছুক্ষণ বসলাম। কি সুন্দর এদের জীবন তাই ভাবি! এই যে বাইরের সভ্য জগতে এত যুদ্ধ, খাদ্যাভাব, লোকের দুঃখকষ্ট—তার কোনো আঁচ এসে সেখানে পৌঁছায়নি। কেরোসিন তেল না পাওয়া গেলেই বা এদের কি। এরা ওসব কোনো জিনিসের ধার ধারে না। বনে বাস করে, বনপ্রকৃতিই এদের সমস্ত জিনিস যোগায়।

এরা বাংলা তো দূরের কথা হিন্দীও বোঝে না, বিহারে বাস করে। কারণ এদের কাছে বাংলাও নেই, বিহারও নেই—ওসব কথার কোনো অর্থ নেই এদের কাছে। এই অরণ্যভূমি এদের মা ; নিজের ক্রোড়ে আশৈশব এদের লালন-পালন করেছে, ক্ষুধায় আর তৃষ্ণায় জল যুগিয়ে। একেই চেনে এরা।

রাজবন্দীর জবানবন্দী



• কাজী নজরুল ইসলাম

[লেখক পরিচিতি ঃ কাজী নজরুল ইসলাম—জন্ম ২৪শে মে ১৮৯৯ (১৩০৩ বঙ্গাব্দ ১১ই জ্যৈষ্ঠ); মৃত্যু ২৯শে জুন ১৯৭৬। বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হাজী ফকির আহমেদ নজরুলের বাল্যকালেই মারা যান। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বাঙালী পল্টনভুক্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। প্রাণ-প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ—ছন্দ বৈচিত্র্যময় কাব্যসৃষ্টি ও আবেগময় গদ্য রচনায় তাঁকে বাংলার শিক্ষিত-সমাজ আলোকসামান্য কবির প্রতিষ্ঠা দান করে। বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতায় বাঙালী পাঠকের মন জয় করেন। তাঁর রচিত অসংখ্য গান ব্যতীত অগ্নিবীণা, দোলনচাঁপা, ফণিমনসা, ছায়ানট, সর্বহারা, চিত্তনামা, নতুন চাঁদ, ঝিঙে ফুল, চন্দ্রবিন্দু, বিষের বাঁশী প্রভৃতি কাব্য এবং ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, বাঁধনহারা প্রভৃতি গদ্য সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।]

আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী। তাই আমি আজ রাজকারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

একধারে রাজার মুকুট; আর একধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড; আর জন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড। রাজার পক্ষে রাজা, হাতে রাজদণ্ড; আর জন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড। রাজার পক্ষে নিযুক্ত রাজবেতনভোগী রাজ-কর্মচারী। আমার পক্ষে সকল রাজার

রাজা সকল বিচারকের বিচারক, আদি অন্তকাল ধরে সত্য—জাগ্রত ভগবান।

আমার বিচারককে কেহ নিযুক্ত করে নাই। এই মহা-বিচারকের দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, সুখী-দুঃখী—সকলে সমান। এঁর সিংহাসনে রাজার মুকুট আর ভিখারীর একতারা পাশাপাশি স্থান পায়। এঁর আইন—ন্যায়, ধর্ম।—রাজার পক্ষে— রমাণু পরিমাণ খণ্ড-সৃষ্টি। আমার পক্ষে—আদি অন্তহীন অখণ্ড স্রষ্টা।

রাজার পেছনে ক্ষুদ্র ; আমার পেছনে রুদ্র। রাজার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ ; আমার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ।

রাজার বাণী বুদ্বুদ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র। আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ, সত্য স্বরূপ।—

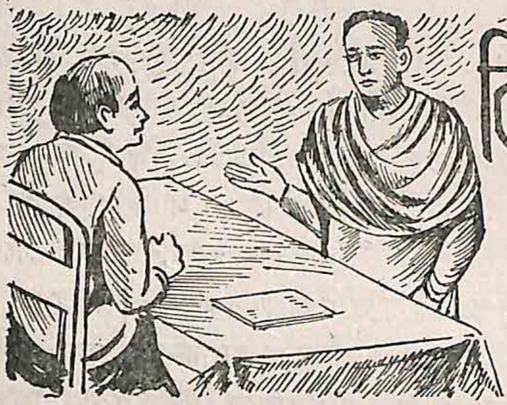
আমি মর, কিন্তু আমার বিধাতা অমর। আমি মরব, রাজাও মরবে, কেননা আমার মতন অনেক রাজবিদ্রোহী মরেছে, আবার এমনি অভিযোগ আয়নকারী বহু রাজাও মরেছে, কিন্তু কোন কালে কোন কারণেই সত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হয়নি তাঁর বাণী মরেনি। আমার হাতের বাঁশী কেড়ে নিলেই বাঁশীর সুরের মৃত্যু হবে না ; কেননা আমি আর এক বাঁশী নিয়ে বা তৈরী করে তাতে সেই সুর ফোটাতে পারি। সুর আমার বাঁশীতে নয়, সুর আমার মনে এবং আমার বাঁশী সৃষ্টির কৌশলে। অতএব দোষ বাঁশীরও নয়, সুরেরও নয় ; দোষ আমার, যে বাজায় ; তেমনি বাণী আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হ'য়েছে, তার জন্য দায়ী আমি নই। দোষ আমারও নয়, আমার বীণার নয়, দোষ তাঁর—যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বীণা বাজান। সুতরাং রাজবিদ্রোহী আমি নই। প্রধান রাজবিদ্রোহী সেই

বীণা-বাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দিবার মত রাজশক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই।—

আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।—আমি পরম আত্ম-বিশ্বাসী। আর যা অন্যায় বলে বুঝেছি—অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি,—কাহারো তোষামোদ করি নাই। আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই—সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য-তরবারীর তীব্র আক্রমণ সমাজে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে,—তার জন্যে ঘরে-বাইরের বিদ্রূপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোন কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে, হীন করি নাই, লাভ ও লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম-উপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই।—কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি।—আমি অজানা, অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। এ আমার অহংকার নয়, আত্ম-উপলব্ধি আত্মবিশ্বাসের চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি।—

আমার ভয় নাই, কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন!

(সংক্ষেপিত)



বিদ্যাসাগর

বনফুল

[লেখক-পরিচিতি ঃ বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)—জন্ম ১৮৯৯, মৃত্যু ১৯৭৯। বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় জন্ম। স্থানীয় কলেজ থেকে আই. এস-সি. পাশ করবার পর এম. বি., বি. এস. পরীক্ষায় পাশ করেন। কিশোর বয়স থেকেই সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। প্রথমে পরিচারিকা ও মালঞ্চ পত্রিকায় লিখতেন। পশ্চিম বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রূপে খ্যাত। উপন্যাস, নাটক, ছোট গল্প প্রভৃতি রচনায় সিদ্ধহস্ত। অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থগুলির মধ্যে স্থাবর, জঙ্গম, ত্রিবর্ণ, বিদ্যাসাগর, মানদণ্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিশোরদের জন্য অনেক গল্প ও ছড়া লিখেছেন।]

মার্শাল—নমস্কার, নমস্কার, আসুন পণ্ডিত।

বিদ্যাসাগর—আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি। তারানাথ তর্কবাচস্পতি মশায় কাজে যোগদান করেছেন। আপনার অনুগ্রহ না হ'লে এটা হ'ত না।

মার্শাল—আমি কিন্তু আশ্চর্যান্বিত, আপনার মত এরূপ মহত্ত্ব দুর্লভ। আমি স্থির করিয়াছি, আপনাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আপনি স্বীকৃত ?

বিদ্যাসাগর—আমি সংস্কৃত-কলেজের ছাত্র, আমার অনেক অধ্যাপক সেখানে এখনও শিক্ষকতা করছেন, সেখানে কি আমার—

মার্শাল—না, না, এবার আমি আর কোন কথা শুনতে চাই না পণ্ডিত। আপনার মত লোককে পুরস্কৃত করিবার সৌভাগ্য হইতে এবার আমাকে বঞ্চিত করিবেন না, এবার আমি নিজের মত চলিব।

বিদ্যাসাগর—আপনি যদি সত্যই আমাকে পুরস্কৃত করতে চান তা হ'লে—

মার্শাল—(সাগ্রহে) উত্তম, বলুন আপনার অভিপ্রায় কি ?

বিদ্যাসাগর—আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কোন কাজে যদি আমাকে লাগিয়ে দেন, তা হ'লে আমি বড় সুখী হই।

মার্শাল—আনন্দের সহিত। আপনি এখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হউন, ক্রমশঃ নূতন স্কীমে যে ইন্‌-স্পেক্টারের পদ সৃষ্ট হইবে, তাহাতেও আপনাকে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিব। মিষ্টার বীটন আপনার উপর খুবই সন্তুষ্ট আছেন, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার সহজেই করিতে পারিবেন। নূতন স্কীমে ইন্‌-স্পেক্টারের নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের অধিকার থাকিবে।

বিদ্যাসাগর—তা হ'লে ত ভালই হয়।

মার্শাল—(সহাস্যে) আপনার নিকট আমি আজ কিন্তু একটি অনুরোধ করিতে ইচ্ছুক।

বিদ্যাসাগর—কি বলুন ?

মার্শাল—অনুরোধটি শুনিবার পূর্বে আপনি একটি কথা ভাবিয়া দেখুন, যে সব সিভিলিয়ান ছাত্র আপনার নিকট বাংলা অধ্যয়ন করে, তারা আপন আপন আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া কত দূর দেশ হইতে আসে, ভাবিয়া দেখুন।

বিদ্যাসাগর—তা তো জানি !

মার্শাল—আরও ভাবিয়া দেখুন, তাহারা চাকুরি করিবার জন্যই কত কষ্টে সমুদ্র পার হইয়া এই গরম দেশে আসে। আপনি যদি তাহাদের প্রতি একটু সদয় না হন, বেচারীরা মারা যায়—এই আমার অনুরোধ।

(বিদ্যাসাগর অনুরোধের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইলেন।)

বিদ্যাসাগর—আমি তো যথাসাধ্য চেষ্টা করি তাদের সাহায্য করতে। আমার অধ্যাপনায় কি আপনারা সন্তুষ্ট নন ?

মার্শাল—না, না, আপনার অধ্যাপনা খুবই সুন্দর, সব রকমে উৎকৃষ্ট, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে জানি। উহারা আপনার মত শিক্ষক সৌভাগ্যবলে লাভ করিয়াছে। আমি সে কথা বলিতেছি না, আমি আপনাকে কেবল একটু নরম হইতে অনুরোধ করিতেছি।

(বাম চক্ষুটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিলেন।)

বিদ্যাসাগর—তার মানে ?

মার্শাল—আমি নিশ্চয় বলিব পরীক্ষক হিসাবে আপনি বড় শক্ত। পরীক্ষায় ফেল করিলে কিন্তু বেচারীদের চাকুরিতে—

বিদ্যাসাগর—যে পাশ করবার উপযুক্ত নয়, তাকে আমি কি ক'রে পাশ করিয়ে দেব ?

মার্শাল—উহাদের অবস্থা চিন্তা করিয়া একটু যদি—

(বাম চক্ষুটি আবার কুঞ্চিত করিলেন।)

বিদ্যাসাগর—ওটি আমার দ্বারা হবে না। আপনারা অন্য লোক দেখুন তা হ'লে।

মার্শাল—(শশব্যস্তে) না, না, না,—আপনি অন্য কিছু মনে করবেন না। ইহা শুধু অনুরোধ মাত্র। আপনি যদি রক্ষা করিতে না পারেন, আমি মোটেই দুঃখিত হইব না।

বিদ্যাসাগর—যার যোগ্যতা নেই তাকে পাশ করানো মানে—বিশ্বাসঘাতকতা করা। তা আমি পারব না।

মার্শাল—বেশ, আপনার অভিরুচি অনুসারেই চলুন। আমি এ বিষয়ে আর কিছু বলিতে চাই না।

(উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন।)

বিদ্যাসাগর—আমিও আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।

মার্শাল—কি বলুন ?

বিদ্যাসাগর—ছুটি চাই। আমার ভাইয়ের বিয়ে, মা বাড়ী যেতে লিখেছেন।

মার্শাল—ছুটি ? কত দিনের ?

বিদ্যাসাগর—অন্তত তিন-চার দিনের।

মার্শাল—তাহা তো এখন অসম্ভব, কলেজের কাজ-কর্ম চলিবে কিরূপে ?

(বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন।)

বিদ্যাসাগর—কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। বিয়ে ছাড়া আমার নিজেরও একটু দরকার আছে বাবা-মায়ের কাছে।

মার্শাল—খুব জরুরী ?

বিদ্যাসাগর—হ্যাঁ, জরুরী। তাঁদের জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত একটা কাজে হাত দিতে পারছি না।

মার্শাল—(বিস্মিত) আপনি কি এখনও সকল কার্য তাঁদের অনুমতি অনুসারে করেন ?

বিদ্যাসাগর—সকল কার্য করি না। কিন্তু এ কাজটিতে হাত দেবার আগে আমি তাঁদের পরামর্শ নিতে চাই।

মার্শাল—এমন কি কাজ ?

বিদ্যাসাগর—বিধবা-বিবাহ। মা বাবা যদি আপত্তি না করেন, তা হ'লে এ নিয়ে আন্দোলন করব আমি। বিধবা-

বিবাহের শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি আমি আগেই বাবার কাছে লিখে পাঠিয়েছি। তিনি এখনও কোন উত্তর দেননি।

মার্শাল—আপনার চেষ্টা খুবই প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু ডাকযোগেই ত আপনি তাঁদের উত্তর পেতে পারবেন।

বিদ্যাসাগর—আমি এর জন্যেই ছুটি চাইছি না। আমার ভাইয়ের বিয়ে, সেই জন্যেই ছুটি চাই।

মার্শাল—আমি খুবই দুঃখিত, ছুটি দেওয়া এখন চলিবে না, কাজের বড়ই ক্ষতি হইবে।

(বাহিরে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল। বিদ্যাসাগর উঠিলেন।)

বিদ্যাসাগর—ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল, উঠি তা হ'লে।

মার্শাল—আচ্ছা, আমি খুব দুঃখিত পণ্ডিত।

(বিদ্যাসাগর চলিয়া গেলেন। মার্শাল সাহেব অফিসের কাজকর্ম করিতে লাগিলেন। সহসা বিদ্যাসাগর আবার প্রবেশ করিলেন।)

বিদ্যাসাগর—আমি ভেবে দেখলাম, আমাকে যেতেই হবে।

মার্শাল—ছুটি না দিলেও যাবেন ?

বিদ্যাসাগর—হ্যাঁ, চাকরি ছেড়ে দিয়ে যাব।

মার্শাল—কি মুশকিল, তাহা হইলে তো ছুটি দিতেই হয়। (হাসিয়া) কলেজের কাজ অপেক্ষা বিবাহের নিমন্ত্রণটাই আপনার নিকট বড় হইল !

বিদ্যাসাগর—নিমন্ত্রণ বড় নয়, মা ডেকেছেন সেইটেই বড়।



জীবন স্মৃতি

জসীম উদ্দীন

[লেখক পরিচিতি ঃ জসীমউদ্দীন—জন্ম ১লা জানুয়ারী ১৯০২। জন্মস্থান ফরিদপুর জেলায়। প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায়, পরে ফরিদপুর শহরে এবং শেষে কলকাতায় পড়াশোনা করেন। জীবিকা হিসাবে প্রথমে শিক্ষকতা, পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, পরে সরকারী প্রচার দপ্তরে কাজ করেন। পল্লীর কবি জসীমউদ্দীন। দেশজোড়া তাঁর কবি-খ্যাতি। নক্‌শী কাঁথার মাঠ তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

আলোচ্য লেখাটি তাঁর 'জীবন স্মৃতি' থেকে গৃহীত।]

জীবনের সুদূর অতীতের প্রথম পটভূমিতে যত দূর দৃষ্টি যায় চাহিয়া চাহিয়া দেখি। এই আলো আঁধারীর দেশে কতক বোঝা যায় কতক বোঝা যায় না, ভাসা ভাসা কয়েকটি ছবি আমার মনে উদয় হয়।

মেঘলা দিনে ঘরের মেঝের নক্সী-কাঁথা মেলিয়া ধরিয়া মা সেলাই করিতেছেন আর গুন গুন করিয়া গান গাহিতেছেন।

বা'জান রাত্র ভোর না হইতেই উঠিয়া নামাজ পড়িতেছেন। তাঁর কণ্ঠে নামাজের সুরগুলি যেন আমার আধ-ঘুমন্ত বালক মনে কি এক অপূর্ব অনুভূতি আনিয়া দিতেছে যা কোনদিনই ভাষায় কহিয়া বুঝাইতে পারিব না।

দরজায় দাঁড়াইয়া এক ফকীর, আতসী-পাথরের মালা গলায় পরিয়া ইউসুফ-জুলেখার পুঁথি সুর করিয়া গাহিতেছে।

সারা গায়ে ধূলিকাদা মাখিয়া সন্ধ্যা বেলায় ঘরে ফিরিয়াছি। মা ধরিয়া লইয়া গা ধুয়াইয়া আঁচল দিয়া মুছিয়া দিতেছেন।

আকাশ জুড়িয়া ঝড়ের দাপাদাপি। শব্দ করিয়া বজ্র ডাকিতেছে। বিছানায় শুইয়া বা'জানের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছি।

সারাদিন মেঘলা আকাশ। সামান্য সামান্য বৃষ্টি হইতেছে। কাছারী ঘরে সেজো চাচা সুর করিয়া পুঁথি পড়িতেছেন। কি পড়িতেছেন বুঝিবার বয়স তখনও হয় নাই। বৃষ্টির সুরের সঙ্গে পুঁথি পড়ার সুর মনের মধ্যে যেন কি এক উদাসীনতা আনিয়া দিতেছে।

শীতের সকালে, নল-খাগড়ার বেড়ার ফাঁক দিয়া লম্বা লম্বা রোদের রেখা আমাদের ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। সেই রোদ-রেখার উপর দিয়া গুঁড়া গুঁড়া ধূলিকণা নানা ভঙ্গী করিয়া যাওয়া আসা করিতেছে।

রূপা মল্লিকের বোন জানকী রঙিন শাড়ি পরিয়া আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। তার হাসি মুখে যেন হলুদের ডুগু ডুগু। রূপে সারা আঙিনা ঝলমল করিতেছে।

সারাদিন এ-বন ও-বন ঘুরিয়া তেলাকুচের পাতা, আমগুরুজের পাতা, হলদী, পানের গাছ, বড় কচুর পাতা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতাম। তাহার পর উঠানের এক জায়গায় সারা দিনের কুড়ান সামগ্রী জমা করিয়াছি। শেষ রাত্রে উঠিয়া আগুন জ্বালাইয়া আগুনের চারি-দিকে ঘুরিয়া মশা তাড়ানোর মন্ত্র পড়িতেছি—

যা যা মশা মাছি উড়িয়া যা
আমাদের বাড়ী থেকে অমুকের বাড়ী যা।

সেই অমুকের বাড়ী বলিতে আমাদের খেলার যাহারা প্রতিদ্বন্দ্বী তাহাদের নাম জোরে জোরে বলিতেছি। তাহারাও আবার মন্ত্র পড়িবার সময় আমাদের নাম করিতেছে।

স্কুল হইতে ফিরিবার সময় ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যাইত। জোরে জোরে পা ফেলিতাম বাড়ী আসিবার জন্য। কিন্তু তালগাছ

দুটির নিকটে আসিয়া সকল ভুলিয়া যাইতাম। কি সুন্দর নৈপুণ্যের সঙ্গে বাবুই পাখিগুলি বাসা বানাইতেছে। একটি পাখি থাকিত বাসার উপরে আর একটি বাসার ভিতরে বসিয়া। সে চঞ্চুর সাহায্যে অতি কলা-কৌশলের সঙ্গে তালপাতার আঁশগুলি উপরে উঠাইয়া দিত, আবার উপরের পাখিটা সেই আঁশকে চঞ্চুর সাহায্যে নিচে বিলি দিয়া দিত। এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাসের পর মাস কোন এক জোড়া পাখি সবুজ পাতার আঁশ দিয়া নতুন বাসা বানাইতেছে। বাসা বানাইতে বানাইতে এ ওর গায়ে পাখা ঘসিয়া আদর করিত।

ঠোঁটের পাতার সুতালী ফুরাইয়া গেলে দুইজনে উড়িয়া যাইয়া অপর গাছ হইতে পাতা চিরিয়া সুতালী তৈয়ারী করিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বাসা বানানর কাজে লাগিয়া যাইতেছে।

পুতুল রাজার দেশে

প্রেমেন্দ্র মিত্র



[লেখক পরিচিতি ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক ও শিশু কিশোর সাহিত্যের অদ্বিতীয় যাদুকর। এঁর রচিত 'সাগর থেকে ফেরা' একাডেমী পুরস্কার ও নানা পুরস্কার পেয়েছে। ইনি এ যুগের এক আশ্চর্য গদ্য লেখক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পকার হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের অসামান্য দান সর্বজনপ্রিয় ও স্বীকৃতি রূপে গ্রহণীয়। কিশোর সাহিত্যের স্রষ্টা হিসাবে ইনি কিশোর জগতে আলোড়ন আনেন। চলচ্চিত্র ও সাহিত্যে, কাব্যে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, নাটকে, রম্য রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত।

একদা 'কল্লোল' যুগকে কেন্দ্র করে যে নতুন সাহিত্য যুগের সূত্রপাত হয়েছিল তার মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন প্রধান ও স্মরণীয়। তাঁর সাহিত্য চিরজয়ী হয়ে আছে। ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রেমেন্দ্র মিত্র পরলোক গমন করেন।]

সে এক দেশ।

সেখানে একটি মানুষ নেই।

তা হলে কি আছে ?

আছে মজার মজার নানা রকমের পুতুল। এখানের সবকিছু কাজই পুতুলরা করে।

কত দূরে সেই দেশ ?

সাত সাগর সাত নদী পার হয়ে একটা দ্বীপ আছে। সেই অবাক করা দ্বীপের তলায় এক সুন্দর রাজ্য।

এই রাজ্যের আরেক ধারে রয়েছে নিঝুমপুরী। এখানে বাস করে দৈত্য পুতুল রাজা। তার নাম হিং টং। আর তারই পাশে রয়েছে পুতুল দৈত্য মন্ত্রী সিন্‌সিন্ আর তার দৈত্য সেনাপতি পুতুল লিন লিন।

দৈত্য পুতুল এক-গাল হেসে বললেন, দেখ বাপু আমার নিঝুম-পুরীতে আমরা অনেক। অন্য পুতুল-রাজ্যে কী হচ্ছে না হচ্ছে তাতে আমার দরকার কি ?

বড় পুতুল সেনাপতি বললে, তা তো ঠিকই বলেছেন ; কিন্তু আমরা যদি মার খাই, আমাদের এই দৈত্য পুতুল রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোন্ পুতুল রাজ্যের সেরা যাদুকর রাখাল পুতুল, তা হলে কি হবে ?

এই কথা শোনার পর পুতুল দৈত্যরাজ হিং টং রেগে তারপর প্রচণ্ড হেসে বললেন, তার মানে ?

এবার মুখ খুললেন মহামন্ত্রী। বললেন, যদি আজ্ঞা দেন তা হলে বলি।

মহামন্ত্রীর কথা শুনে রেগে গিয়ে দৈত্যরাজ হিং টং বললেন, ভূমিকা না করে সহজ ভাষায় বল কি হয়েছে ?

মহামন্ত্রী বললেন, আমাদের এই চীনের প্রাচীর কারও তো অজানা নয়, হয়ত আমাদের প্রতিবেশী জাপানী পুতুলদের লোভ থাকতে পারে। যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি।

মহামন্ত্রীর কথা শুনে রেগে গিয়ে দৈত্যরাজ বললেন, বল কি হয়েছে ?

মহামন্ত্রী বললেন, আমাদের গুপ্তচরের রাজ্যে এক ভিনদেশীকে দেখা যাচ্ছে। হাতে তাঁর বাঁশী। যতদূর মনে হচ্ছে সে রাখাল পুতুল রাজা।

এই কথা শোনার পর দৈত্যরাজ হিং টং বললেন, যদি চীন দেশের আশেপাশের কোন পুতুলেরা আসে, তাদের ধরে নিয়ে এসো আমার কাছে। আমাদের প্রাচীরকে ডিঙিয়ে কে আসতে পারে? আর যদি পুতুল রাজ্য হয়, তা হলে তো কথাই নেই।

এই বলে দৈত্যরাজ হিং টং একবার হাসলেন। তারপর বড় পুতুল সেনাপতিকে বললেন, তোমাকে যার জন্যে পাঠিয়েছিলাম তার হল কি? রাজকুমারী মিসিসিরাকে যেমন করে হোক একবার ধরে আনা চাইই।

সেনাপতি বললেন, তার জন্য ভাববেন না। আমি ছলে বলে কৌশলে যেমন করে হোক মিসিসিরাকে ধরে আনব।

এমন সময় পুতুল গুপ্তচর পিকিং-এ এসে হাজির। সে একটা মস্ত সেলাম জানিয়ে বললে, মহান পুতুল দৈত্যরাজ, ওখানে প্রাচীরের সামনে ভিনদেশী পুতুল রাখাল রাজাকে দেখা যাচ্ছে। আপনার অনুমতি পেলে ধরতে পারি।

বড় সেনাপতি বললেন, তা আর বলতে? এখনি যাও, তাকে ধরে নিয়ে এসো।

দৈত্যরাজ হিং টং বললেন, এখন নয় আরও পরে। তুমি কদিন লক্ষ্য কর এর গতিবিধি। তারপর সেনাপতি তুমি এখনি আমার মায়াবী আংটির সাহায্যে একটা পাখী হয়ে উড়ে যাও আকাশে। আর আকাশে গিয়ে যেমন করে হোক রাজকন্যা মিসিসিরাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসো আমার রাজ্যে।

সেনাপতি বললে, তাই হবে। তাহলে আমাকে দাসী করার মন্ত্র দিন।

এরপর দৈত্যরাজ হিং টং সিংহাসন থেকে নামলেন। তারপর তাঁর মায়াবী আংটিকে হাত থেকে খুলে নিয়ে এলেন। সামনের একটা ফটকে জোর আওয়াজ করলেন।

আর তখনি দেখতে দেখতে কোথা থেকে ছুটে এলো এক ডাইনি পুতুল।

ডাইনী বুড়ী পুতুল বললে, বল কি আমায় করতে হবে ?

দৈত্যরাজ বললেন, তুমি তোমার মন্ত্রবলে সেনাপতি সিন্‌সিনকে একটা চমৎকার লাল টুকটুকে টিয়াপাখী করে দাও।

ডাইনী বুড়ী বললেন, ঠিক আছে। আর যেই না বলা, সেই সঙ্গে পুতুল সেনাপতি হঠাৎ পড়ে গেল মাটিতে। আর ডাইনি বুড়ী তখন তার ঝুলি থেকে পাথর বার করে সেনাপতির গায়ের ওপর ঘসে দিল।

রাখাল পুতুল বললে, কোন্‌ রাজ্য ? তার কে রাজা তা তো বললে না ?

এবার মুখে হাসি টেনে ছোট পুতুল বললে, আমাদের রাজা দৈত্যরাজ হিং টং। আর রাজ্যের নাম নিঝুমপুরী মানে পিকিং রাজ্য থেকে অনেক দূরে। এই সীমানায় যাকে পাব, তাকেই ধরে নিয়ে যাব। আমাদের দৈত্য পুতুল রাজার এই হুকুম।

এই কথা শোনার পর রাখাল পুতুল বললে, আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি। তাহলে আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে তোমার লাভ ?

পুতুল রাখাল রাজার কথা শুনে বড় পুতুল তার লম্বা লম্বা পা ফেলে রাজা দু'জনকে যাদের নাম কং আর সং তাদের হুকুম দিলে, ধর এই রাখাল রাজাকে।

আর সেই কথা শোনামাত্র কং আর সং পুতুল রাখাল রাজাকে ধরলে।

পুতুল রাখাল রাজা বললে, যাচ্ছি। কিন্তু আমায় আবার ছেড়ে দেবে তো ?

পুতুল রাখাল রাজার কথা শোনামাত্র এই চারজন পুতুল দৈত্য একবার হেসে উঠল। এদের মধ্য থেকে বড় পুতুল, দৈত্য পুতুল রাজা ছেড়ে দেবেন কিনা জানি না, আমাদের ধরে নিতে হুকুম আছে, তাই ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

এইবার ছোট পুতুল তার জামার পকেট থেকে একটা গুপ্ত

সংকেত বার করলে। তারপর পুতুল রাজার হাত ধরে হাসতে হাসতে বললে, ওহে ভিনদেশী পুতুল তোমার চোখ দুটি বন্ধ কর।

পুতুল রাখাল রাজা সত্যি সত্যি তাই করলো।

আর একটু পরে যখন পুতুল রাখাল রাজা তার চোখ খুলল, সে দেখতে পেল একটা বিরাট রাজপুরীতে সে এসেছে। ফটকের সামনে আসতেই রাখাল রাজা দেখতে পেল মস্তবড় একটা ফটক, আর সেই ফটকে দু'জন পুতুল প্রহরী।

ছোট পুতুল সংকেত করার সাথে সাথে প্রহরীদের মধ্যে একজন প্রহরী তাকে একটা ঘরে ধরে নিয়ে এলো।

তারপর একজন পুতুল প্রহরীকে পাহারায় রেখে ছোট পুতুল চলে গেল।

পুতুল রাখাল রাজা অসহায়ের মত চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

তারপর জানালার দিকে তাকাতেই পুতুল রাখাল রাজা দেখতে পেল বিরাট রাজপুরীটা সত্যি সত্যি নিস্তব্ধ হয়ে আছে।



নরুনের বদলে নাক
শিবরাম চক্রবর্তী

[**লেখক পরিচিতি ঃ** শিবরাম চক্রবর্তী। জন্ম ১৯০৪। কিশোর সাহিত্যে শিবরাম একজন অদ্বিতীয় শিল্পী। এঁর রচিত প্রতিটি বই বাংলার কিশোর সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' 'কলকাতার হালচাল' এঁর বিখ্যাত বই। হর্ষবর্ধনকে নিয়ে নানান ধরনের গল্প লিখে বাংলার কিশোর সাহিত্যে আলোড়ন এনেছেন। বড়দের জন্য স্ত্রীর প্রেম ভালবাসা ও মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী এঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।]

বিনির গল্প আমি বহুৎ লিখেছি।

বিনির গল্প আমার কম নয়। কিন্তু এই কাহিনীটি যেমন বিনিময়, তেমনি আবার বিনিময়ের।

পৃথিবীর বড়ো বড়ো ঘটনার সূত্রপাত যেমন করে হয়ে থাকে। অর্ধেকটা কাঁথা সেলাইয়ের মতই, একটুখানি ছিদ্রধরে,—সামান্য ছুঁচের রন্ধ্র দিয়ে সূত্রপাতে শুরু হয় যেমন। এই বিনিময়-পর্বের সূচনাও ঠিক তেমনি করেই হয়েছিল।

রাত প্রায় ন'টা তখন।

শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছি, এমন সময় খিড়কি দিয়ে পাশের বাড়ীর গিন্নীর পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। বিনির কাছে তিনি এলেন ; পদশব্দে টের পেলাম।

গলার আওয়াজও কানে এল সঙ্গে।

'ভাই, তোমার কি একটু সর্ষেতেল হবে?'

'হ্যাঁ দিদি।'

'দিতে পারো একটুখানি? কর্তা এই এত রাত্তিরে এক ইলিশ মাছ নিয়ে হাজির। ভাঁড়ে দেখি এক ফোঁটাও তেল নেই। এখন এই রাত্তিরে আবার কাকে বাজারে পাঠাই।'

তারপরে আর একটি কথাও কানে এলো না। বুঝতে পারলাম যে আমাদের নিস্তেল করে প্রতিবেশীদের তেল কিছুটা বাড়ালো।

না, আজ রাত্তিরে আর কোন কথা নয়; কাল সকালে বিনির সঙ্গে এই ব্যাপারে ফয়সালা হবে।

প্রতিবেশীদের ধার এমনিতেই কম নয়, তারপর যে পাড়ায় এসে এখন ওঠা গেছে আমার ধারণায় এখানকার এরা যেন আরো বেশী ধারালো।

তেলের ধার দিয়ে শুরু করেছেন, মনে হচ্ছে, ধারের পথটা তেল-তেলে করে নিয়ে সেই পিছল পথেই সুরুৎ করে আমাদের যথাসর্বস্ব উদ্ধার করবেন।

কিন্তু তেলের কথাটা তার পরদিন মনে হলো না। কি করে পিছলে গেছলো মন থেকে। মনে পড়লো দিন কয়েক পরে।

'হ্যাঁরে বিনি, তেলটা কি তারা ফিরিয়ে দিয়েছে?'

'না দাদা।' ঘাড় নাড়লো বিনি।—'ভুলে গিয়েছে হয়ত। তা, না-ই বা দিলো, সামান্য জিনিস তো। কিছু তাতে আসে যায় না।'

'যায় আসে না? এমনি করেই যায় আসে। এই সামান্য থেকেই শুরু করে হাতী ঘোড়া চলে যায়।' বলতে চাই আমি— 'আমীর লোক ফকির হয় এই করেই।'

আমীর অথবা ফকির—দুটোর কোনটাই আমি না হলেও এই ভাবে ফাঁকির ভেতর পড়াটা আমার ভাল লাগে না। কথাটা আমার মনের মধ্যে জুতোর পেরেকের মতন সর্বক্ষণ খচ্‌খচ্‌ করে। মনের স্বস্তি লোপ পায়। ভাবতে ভাবতে একদিন মাথাই ধরে যায় শেষটায়!

'গোটা চারেক টাকা দে তো আমায়।' হাত পাতি বিনির কাছে, 'এক বোতল অ-ডি-কোলন কিনে আনি। যা মাথা ধরেছে···বাপ্ !'

—'আজ বেস্পতিবার, দোকান-পাট বন্ধ না?' মনে করিয়ে দেয় সে; 'দাঁড়াও, ও বাড়ীর দিদির কাছ থেকে চেয়ে আনা যাক।'

'পাবি তো?' আমার সন্দেহ ব্যক্ত না হয়ে যায় না।

'ওদের কর্তার তো প্রায়ই মাথা ধরে জানি। তখন আছে নিশ্চয়। আর থাকলে কি, আর পাবো না? ও বাড়ির দিদি তেমন নয়।'

আরে কি আশ্চর্য আমার অবিশ্বাস শিথিল করে একটি সরু বোতল হাতে ফিরে আসে!

পরের সকালেও বোতলটাকে দেরাজের কোণে দেখতে পাই।

'এ কিরে! এখনো এটা ফিরিয়ে দিস্‌নি যে?'

'দেব'খন। অতো তাড়া কিসের?'

কিন্তু বিনির কোন তাড়া দেখা না গেলেও ধারাবাহিক দেখা গেল···

সন্ধ্যের মুখে প্রতিবেশী গিন্নী এসে আমাদের আধ ডজন পেয়ালা-পিরিচ ধার করে নিয়ে গেলেন।

তাঁর কর্তার জনকয়েক বন্ধু এসেছেন। তাঁদের জন্য দরকার।

আমি গরম গেলাসে রুমাল জড়িয়ে হাঁড়িমুখ করে সান্ধ্য চা-পান সারলাম।

বিনি কাঁসার বাটিতে নিজের চা নিয়েছিল। তপ্ত বাটি ধরে সে কি করে আঁচল দিয়ে বাগায়, লোলুপনেত্রে দেখছি, কিন্তু না, তাকে আর তা খেতে হোল না।

একটু পরেই একটা ছেলে লাফাতে লাফাতে এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল।

আমাকে হতাশ করে সে পাশের বাড়ির চা-পানের আসরে হাজির হোলো।

কাঁসার বাটিতে না খেয়ে সে পরের বাটিতে খেতে গেল।

সেদিন রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে একটা হাঁচোড়-পাঁচোড় আওয়াজ পেলাম।

লাফিয়ে উঠে বসতে হোলো বিছানায়…'বিনি! বিনি!'

পাশের ঘর থেকে সাড়া এলো—'কী। কী হলো। কী হয়েছে দাদা?'

'আমার ঘরের ভেতর কে যে সেঁধিয়েছে। চোর কিংবা ভূত।' বলতে গিয়ে শিউরে উঠি আমি!

চোর কিংবা ভূত তখন আপত্তির স্বর তোলে—সে চোর কিংবা ভূত যে নয় এ কথাটাই জানাতে বোধ হয় বলে মিঞাও!

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে।

রেগে বলি—'এই মিঞাকে আবার আমদানি করলি—কোত্থেকে শুনি?

'পাশের বাড়ির দিদির কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।'

'চেয়ে এনেছিস! বেড়াল কি কেউ আবার চেয়ে আনে!

বাড়ি বয়ে কেউ আনতে যায় এ জিনিস? ধন্যি মেয়ে তো?'

বিস্ময় আমার আর্তনাদকে ছাপিয়ে ওঠে।

'দিদির কাছ থেকে কতো করে চেয়ে এনেছি। ইঁদুরের যা উৎপাত সেইজন্যেই আনতে হোলো। জাতিকল পাতলে তো আর রক্ষে থাকতো না, ইঁদুর ধরতে গিয়ে তুমিই ধরা পড়ে যাবে—যে রকমের আনমনা মানুষ তুমি? নিজের কলে নিজেই তুমি ধরা পড়ে যাবে।'

'তা বটে! কথাটা আমার মানতে হয়।'

মিঁউ! মিঞাও বিনির কথায় সায় দেয়।

কিন্তু তারপর মিঞার আর নড়বার নামটি নেই।

সকালে উঠে তো দেখলামই, এমনকি বিকালেও তাকে আমাদের বাড়িতে দেখা গেল।

'এ কি এটাকে দিয়ে এলিনা এখনো?' বিনিকে বললাম।

'যাচ্ছে না যে! কি করবো?'

'বোধ হচ্ছে পুনর্বাসনের জায়গাটা ওর পছন্দ হয়েছে। স্বস্থানে ফিরে যেতে আর রাজী নয়।'

'থাক না, ক্ষতি কি?' সে বলেঃ 'তোমাকে তো আর কামড়াচ্ছে না?'

'দাঁত বসাচ্ছে না বটে, কিন্তু আঁতে বসাচ্ছে। কান মলছে দিন রাত! ওর এই ম্যাও-ম্যাওয়ে লেখাপড়া সব আমার মাথায় উঠে গেল। ও যদি বাড়ি না ছাড়ে, তো মনে হচ্ছে ওর জন্যেই এই বাড়ী আমাদের ছাড়তে হবে।

পরের দিন সকালে পড়শী গিন্নী আমাদের বাঁশের ঝাড়নটা চেয়ে নিয়ে গেলেন।

নিজেদের ঘরের কালিঝুলি তাড়াবার জন্যে।

কিন্তু তাড়ানর পরেও ঝাড়নটি ফেরত না দিয়ে সন্ধ্যেবেলায় এসে আবার তার উপরে অ্যাইসব্যাগ আর থার্মোমিটারটি নিয়ে গেলেন আমাদের।

তাঁর কর্তার নাকি গা গরম হয়েছে। আইসব্যাগটারও দরকার নাকি, জ্বরটা বেড়ে গিয়ে বিকারে দাঁড়িয়ে যায় যদি।

নির্বিকারেই দিতে হলো অগত্যা।

বিনি গিয়ে ওদের টর্চ লাইট আর ছাতা নিয়ে এলো।

'টর্চটা এনেছিস বেশ করেছিস।' আমি বলি ঃ 'বেড়ালটাকে বাঁচিয়েছিস আমার টর্চটার থেকে। রাতবিরেতে উঠতে গিয়ে কখন যে ওর গায়ে পা দিয়ে ফেলি সেই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। এই পদভারে ব্যাটা যদি চ্যাপ্টা হয়ে যায় তো আর রক্ষে থাকবে না। খ্যাঁক করে কামড়ে দেবে নির্ঘাত।'

আর, একটা খ্যাঁকশিয়াল, কি খেঁকি কুকুরের চেয়ে একটা বেড়ালের খ্যাঁক কিছু কম মারাত্মক হবার কথা নয়।

'ওটা আনলি ভালো করলি। কিন্তু ছাতাটা আবার আনতে গেলি কি জন্যে?'

'এমনিই নিয়ে এলাম—কিছু না ভেবেই।'

'অসম্ভব, কিছু না ভেবে তুই কিছু করবি তা হতেই পারে না। আমার ধারণা অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে যে কাজ করে সে তোর অগ্রে। তোর অগ্রজ এই আমি আমার পশ্চাতে আর কেউ নেই।'

'কেন আনলাম বলবো? তোমায় হারাবার জন্যে।'

'ভালোই করেছিস তা'হলে। অনেকদিন ধরে আমি একটা ছাতা হারাতে পারিনি। কেউ আর আমায় ছাতা ধার দেয় না'—সখেদে জানাই: 'তাহলে ছাতাটা দিস কাল সকালে, যখন আমি বেরুবো, কেমন? হারানোর চেষ্টা করা যাবে।'

কিন্তু সকালে ওদের ছেলেটা আমার সাইকেলটা নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে যাবার জন্য।

সাইকেলের অভাবে সারাদিন হণ্টন দিয়ে সব কাজ সেরে ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে দেখলাম বিনি ওদের থেকে বোনার কাঠি নিয়ে এসেছে।

সেই সঙ্গে কয়েক গোছা উলও আবার।

বোনার কাজে তাকে একমনা দেখা গেল!

'তোমার জন্য সোয়েটার বুনছি।' বলল সে।

'খুব ভালো কাজ করছিস্।' আমি উৎসাহ দিই, 'এটা শুধু বোনার কাজই নয়, বোনের কাজও বটে।'

কিন্তু মনের ফূর্তি কতক্ষণ থাকবার!

একটু পরেই ঠিকে ঝি কাপড় কাচবার সাবান চাইতেই মেজাজ চড়ে গেল!

'সে কি গো? সকালেই যে তোমাকে সানলাইটের দু-দুটো বড়ো বড়ো বার দিয়েছি?'

'দিদিমণি চেয়ে নিলেন যে ফের।'

'ফের?' একই প্রশ্ন আমি দু'জনকে ফেরত দিই।

'হ্যাঁ, রানুদিকে দিতে হলো কিনা?'

'ফের আবার?'

বার বার এই ফেরের বাজি ভালো লাগে না। ধৈর্যচ্যুতি ঘটে!

বলি 'শোন, ওই বুনোন কাঠিগুলো এনেছিস, বেশ করেছিস, ওগুলো আর ফিরিয়ে দিসনে। আরো গোটা দুই উলের গুলতি চেয়ে নিয়ে আয়। বেশ বড়ো বড়ো দেখে। আর—আর কি? যদ্দুর বুঝেছি, সাইকেলটা আর ফিরে পাবো না। তার বদলে কি নেওয়া যায় বল তো।'

'ওদের গ্রামোফোনটা নিয়ে আসা যাক, কেমন?' বিনি আমার উপদেশের অপেক্ষা রাখে; 'আর সেই সঙ্গে রেকর্ডগুলোও, কি বলো দাদা?'

'না, রেকর্ডগুলো না। এগুলো একশোবার শুনে কান পচে গেছে। গ্রামোফোনটা এনে আটকে রাখতে পারলে কান বাঁচে বরং?'

'রেকর্ডগুলো আনবো না তা হলে?'

'না, না, নিয়ে আয়। এগুলোর ওপর শোধ তোলা যাক। ওগুলো আমি ভাঙবো--একে একে—একটা একটা করে। জীবনে তো কোন রেকর্ডই নেই। এবার রেকর্ড ভেঙ্গে একটা রেকর্ড রাখা যাক না হয়।'

গ্রামোফোনটা আনতে না আনতেই ও বাড়ির গিন্নী কয়েকটা মুটে সঙ্গে নিয়ে এলেন।

এক রাত্তিরের জন্য ওদের বাড়িতে এক অতিথি এসেছেন, তার জন্য বিছানার দরকার।

যদি আমাদের কোনো বাড়তি বিছানা থাকে—

বাড়তি বলতে আমার বিছানাটাই ছিলো।

চৌকিসমেত মুটেরা তাই ধরাধরি করে নিয়ে গেল।

একটু বাদে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ও বাড়ির ইজিচেয়ারটা পেলাম। বিনিকে গিয়ে আনতে হয়নি, একটা মুটেকে দিয়ে ওরাই দয়া করে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ইজিচেয়ারে শুয়ে কোনো রকমে আন্‌ইজিলি কাটালাম রাতটা। একটা নয়—সাত সাতটা রাত!

অতিথি চলে গেলেও চৌকিটা ফেরত দেবার ফুরসত ওদের হচ্ছিল না।

এদিকে ইজিচেয়ারে রাতের পর রাত দুঃস্বপ্নে কাটছিলো আমার।

একদিন তো মাঝরাতে এক বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখে আমি চেঁচিয়ে উঠেছি—'বিনি, বিনি আমার টুথব্রাশ ? আমার টুথব্রাশ !'

'এই রাত্তিরে টুথব্রাশে কি হবে দাদা ?' ওঘর থেকে সে ছুটে আসে।

'ও বাড়ির গিন্নী। গিন্নী কি কর্তাই। কিংবা সেই ছোঁড়াটাই তাড়া করে আসছে। কি নিতে এসেছে কে জানে ! আর যা যাক, আমার তো সর্বস্বই গেছে, এখন—এখন শুধু ওই বুরুশটাই সম্বল। আমার টুথব্রাশটা তুই আমায় এনে দে।'

তারপর টুথব্রাশটা পেয়ে পাঞ্জাবীর বুকপকেটে ফাউণ্টেন পেনের পাশে এঁটে রেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি—'কী জানি যদি এটাও নিয়ে যায় শেষটায়।'

দিনকতক বাদে বিনি একটা কথা পাড়ে—'শুনছো ও বাড়ির গিন্নী বলছিল যে ওদের বাড়িটায় রাতদিন যেন ঝড় বয়। মোটেই তেমন সুবিধের নয়। ঘরগুলো যেন হাওয়ায় অস্থির। জিনিসপত্র কোনো কিছু চাপা না দিয়ে রাখবার যো নেই। ও বাড়ী ওদের পছন্দ নয়।'

'তো কী ?' আমি শুধোই।

'দক্ষিণ একেবারে খোলা কি না।'

'দক্ষিণ খোলাতো আমি তার কি করবো ? আমি কি করতে পারি ?'

ভেবে দেখলে ওদের এই সমস্যায়—এরকম প্রশ্নে বাধ্য হয়েই আমাকে নিরুত্তর থাকতে হবে।

কেননা উত্তর দিকটা কিছু আমাদের হাতধরা নয় যে আমাদের মর্জি মত তাদের আমরা দাক্ষিণ্য করতে পারি।

'আমাদের বাড়িটা তাদের ভারী পছন্দ। চারিদিক থেকে কেমন চাপা হাওয়া ফাওয়া নেই একদম। ঝড় ঝাপটার উৎপাত নেই। তাই ওদের গিন্নী—।'

'তা ওদের গিন্নীর পছন্দ হলেই বা কি করছি?'

'তুমি তো হাওয়া খেলানো ঘর, হাওয়াদার বাড়িই বেশি ভাল-বাসো, তাই না? এমন বন্ধ গুমোট ঘর তো তোমার পছন্দ নয়। তাই আমি বলছিলাম কি—

আর বলতে হয় না।

আমিই ওকে বলি—'তা বেশ তো, কালই ওদের বাড়িতে গিয়ে ওঠা যাবে না হয়। যদি তুই তা চাস্।'

'কাল কাল কেন? এখন গেলেই তো হয়।'

'এখন? এই ভর-সন্ধ্যেয়? এই সব আসবাবপত্র এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি—এত সব এখন বওয়া-বওয়ি করে কে?'

কিছু বইতে হবে না। এ বাড়ির জিনিসপত্র ত সব ও বাড়িতে। আজ বিকেলে এসে আমাদের দরজার পাপোষটাও নিয়ে গেছে। এখন তুমি যদি শুধু নিজেকে নিয়ে একটু নড়তে পারো—।

'নড়াতে হবে।'

ইজিচেয়ার থেকে নিজেকে আমি টেনে তুলি: 'আর কিছু না। শুধু ওদের বেড়ালটার জন্যেই। হাওয়ার জন্যে নয়, যদি হয়, শুধু ওর জন্যেই এখান থেকে হাওয়া হতে হবে আমাদের। মনে হচ্ছে এখানে ওর মন বসে গেছে, এবাড়ি ও আর ছাড়বে না।'



[লেখক পরিচিতি ঃ সৈয়দ মুজতবা আলী—জন্ম ১৯০৫ মৃত্যু ১৯৭৩। পিতৃনিবাস শ্রীহট্ট জেলায়। জন্ম আসামে, কাছাড় জেলার করিমগঞ্জে। দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট থেকেই সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা পান। একাধিক ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। জার্মানী বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি পান। তাঁর মত লেখক বাংলা সাহিত্যে বিরল। দেশে বিদেশে, চাচাকাহিনী, পঞ্চতন্ত্র, অবিশ্বাস্য প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

তাঁর এই রচনাটি 'দেশে বিদেশে' ভ্রমণ কাহিনীর একটি অংশ। পাঠানদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই কাহিনীতে উল্লেখ আছে।]

বাইরে ঠা ঠা আলো ; নটা বাজল কি ক'রে, আর পেশোয়ারে পৌঁছুলুম বা কি করে ? একটানা মুসাফিরির ধাক্কায় মন তখন এমনি বিকল হ'য়ে গিয়েছিল যে, শেষের দিকে ঘড়ির পানে তাকানো পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এখন চেয়ে দেখি, সত্যিই ন'টা বেজেছে।

প্ল্যাটফরমে বেশী ভিড় নেই। জিনিসপত্র নামাবার ফাঁকে লক্ষ্য করলাম যে, ছ'ফুটি পাঠানদের চেয়েও একমাথা উঁচু এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কাতর নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে যতদূর সম্ভব নিজের বাঙালিত্ব জাহির করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এসে চোস্ত উর্দুতে আমাকে বললেন, তাঁর নাম শেখ আহমদ আলী।

আমি নিজের নাম ব'লে এক হাত এগিয়ে দিতেই তিনি তাঁর দু'হাতে সেটা লুফে নিয়ে দিলেন এক চাপ—পরম উৎসাহে ও পরম সম্বর্ধনায়। সে চাপে আমার হাতের পাঁচ আঙুল তাঁর দুই থাবার ভিতর তখন লুকোচুরি খেলছে। চীৎকার ক'রে যে লাফ দিয়ে উঠিনি, তার একমাত্র কারণ বোধ হয় বাঙালীর স্বাভাবিক ধৈর্যধারণ শক্তি। আর তাই সেদিন পাঠান মুলুকের পয়লা-কেলেঙ্কারী থেকে বাঙালী ইজ্জত বাঁচাতে পারল! কিন্তু হাতখানা কোন্ শুভলগ্নে ফেরত পাব যখন সে কথা ভাবছি, তখন তিনি হঠাৎ আমাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে খাস পাঠানী কায়দায় আলিঙ্গন করতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর সমান সমান উঁচু হলে কি হতো বলতে পারি না; কিন্তু আমার মাথা তাঁর বুক অবধি পেঁছয়নি ব'লে তিনি তাঁর এককড়া জোরও আমার গায়ে চাপাতে পারছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উর্দুতে পশ্তুতে মিলিয়ে যা বলে যাচ্ছিলেন তার অনুবাদ করলে অনেকটা এই দাঁড়ায় 'ভাল আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো, বেজায় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েননি তো?' আমি জী-হ্যাঁ জী-না করেই যাচ্ছি আর ভাবছি বাড়ীতে পাঠানের কাছ থেকে তাদের আদব-কায়দা কিছুটা শিখে নিলে ভাল করতুম। পরে ওয়াকেবহাল হ'য়ে জানলুম, বন্ধুদর্শনে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে নেই, দেওয়া কায়দা নয়। উভয় পক্ষ একসঙ্গে প্রশ্নের ফিরিস্তি আউড়ে যাবেন অন্তত দু'মিনিট ধ'রে; তারপর হাত-মিলানো বুক-মিলানো শেষ হ'লে একজন একটি প্রশ্ন শুধাবেন, 'কি রকম আছেন?' আপনি তখন বলবেন, 'শুকর আলহাম্দুলিল্লাহ্' অর্থাৎ খোদা তা'আলাকে ধন্যবাদ. আপনি কি রকম? তিনি বলেন, 'শুকর আলহাম্দুলিল্লাহ্।' সর্দি কাশির কথাই নিয়ে বিনিয়ে বলতে হলে তখন বলতে পারেন, কিন্তু মিলনের প্রথম ধাক্কায় প্রশ্ন-তরঙ্গের উত্তর নানা ভঙ্গীতে দিতে যাওয়া 'সখ্ৎ বেআদবি'।

খানিকটা কোলে-পিঠে, খানিকটা টেনে-হিঁচড়ে তিনি আমাকে

স্টেশনের বাইরে এনে একটা টাঙায় বসালেন। আমি তখন শুধু ভাবছি, ভদ্রলোক আমাকে চেনেন না, জানেন না, আমি বাঙালী, তিনি পাঠান—তবে যে এত সম্বর্ধনা করছেন, তার মানে কি? এর কতটা আন্তরিকতা আর কতটা লৌকিকতা?

আজ বলতে পারি, পাঠানদের অভ্যর্থনা সম্পূর্ণ নির্জলা আন্তরিক। অতিথিকে বাড়ীতে ডেকে নেওয়ার মতো আনন্দ পাঠান অন্য কোন জিনিসে পায় না—আর সে অতিথি যদি বিদেশী হয়, তা'হলে তো আর কথাই নেই। তারো বড় যদি সে অতিথি পাঠানের তুলনায় রোগা-দুবলা সাড়ে পাঁচ ফুট হয়। ভদ্রলোক পাঠানের মারপিট করা মানা। তাই সে শরীরের অফুরন্ত শক্তি নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না। রোগা-দুবলা লোক হাতে পেলে আর্তকে রক্ষা করার স্বর্গীয় আনন্দ সে তখন উপভোগ করে।

টাঙা তো চলছে খাস পাঠানী কায়দায়। আমাদের দেশে সাধারণত লোকজন রাস্তা সাফ ক'রে দেয়—গাড়ি সোজা চলে, পাঠান মুলুকে লোকজন যার যে রকম খুশি চলে, গাড়ি এঁকে-বেঁকে রাস্তা করে নেয়। ঘণ্টা বাজানো, চীৎকার করা বৃথা। খাস পাঠান কখনো কারো জন্য রাস্তা ছেড়ে দেয় না। সে স্বাধীন, রাস্তা ছেড়ে দিতে হ'লে তার স্বাধীনতা কোথায়? কিন্তু ঐ স্বাধীনতার দাম দিতেও সে কসুর করে না। ঘোড়ার নালে চোট লেগে যদি তার পায়ের এক খাবলা মাংস উড়ে যায়, তা'হলেও সে রেগে গালাগালি, মারামারি বা পুলিস ডাকাডাকি করে না। পরম অশ্রদ্ধা ও বিরক্তি সহকারে ঘাড় বাঁকিয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করে, 'দেখতে পাস না? গাড়োয়ানও স্বাধীন পাঠান—ততোধিক অবজ্ঞা প্রকাশ করে বলে, 'তোর চোখ নেই?' ব্যাস্। যে যার পথে চলল।



[লেখক-পরিচিতি ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী লেখক। এঁর ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। এঁর রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'অতসীমামি', 'শহরবাসের ইতিকথা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যের বিশেষ স্মরণীয় অবদান। ১৯০৮ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়। গল্পটির নাম 'অতসীমামি' ; বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে গল্পটি নিয়ে বিশেষ আলোড়ন জাগে। তিনি ছিলেন সত্যের শিল্পী, তাঁর লেখায় পল্লীবাসীর জীবনের সুখ-দুঃখ ও মধ্যবিত্তের ছবি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।]

ওরা দু'জনে হাঁটছিল, নিস্তব্ধে। ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ব্রহ্মপুত্রের ধার ধরে।

টইটম্বুর ঘোলাজলে বইছিল কল্‌কল্‌ শব্দ। সূর্যের আলোয় চিকচিক ব্রহ্মপুত্র নদীরেখা।

পাড়ে মাটি বেশ নরম। হাঁটতে হাঁটতে পা বসে যাচ্ছিল ওদের। ওদের মাঝে মাঝে বুটজুতোর শব্দে নরম পাড় খসে পড়ছিল নদীর বুকে। হাঁটছিল সন্তর্পণে ওরা।

দূরে যেখানে ব্রহ্মপুত্রের বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে, সেই বাঁকের মুখে দেখা যাচ্ছিল একটা ডিঙি নৌকা। দূর থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না নৌকাটিতে কেউ আছে কিনা।

আর কয়েক পা এগোতেই ওরা দেখতে পেল নৌকার পাটাতনে কি যেন একটা মৃদু নড়ছে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বৃন্দাবন। ওর দেখাদেখি হরকান্ত দাঁড়িয়ে নৌকাটা ভাল করে লক্ষ্য করল। বৃন্দাবন আঙুল তুলে নৌকাটা দেখাল।

—ওটা কি নড়ছে বলত ?

হরকান্ত একদৃষ্টেই তাকিয়ে ছিল নৌকার দিকে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিল না। বললে, কোন মাঝি বোধহয় লুঙ্গি চুবোচ্ছে।

—না, আমার মনে হয় কেউ ঘুমুচ্ছে হরকান্ত বললে।

—ঘুমুচ্ছে! এই ভরা গাঙে কেউ ডিঙিতে ঘুমোয় ? তার মাথায় আবার ঠা ঠা রোদ্দুর।

—আরে মাঝিরা সব পারে। আর ভরা গাঙ্গে ওরা কোনদিনই ও সব ডরে না। তোর মনে নেই পরাশরের কথা।

কথাটা শেষ করে বৃন্দাবন কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

হরকান্ত কোন কথা বলল না। পরাশরের কথা উঠতেই হু হু করে উঠল বুক। আবার হাঁটতে লাগল নিঃশব্দে।

তারপর এক সময় ওদের দু'জনের ছায়া লম্বা হতে হতে ব্রহ্মপুত্রের জলে গিয়ে পড়ল। ঢেউয়ের তালে তালে ছায়া দুটোও চলল দুলতে দুলতে।

মনে হচ্ছিল দুটো মানুষ যেন অন্তরঙ্গ ভাবে ভাসছে নদীর বুকে। কখনও তারা পাড়ে ধাক্কা খাচ্ছে। কখন বা ডুবে যাচ্ছে জলে।

দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল হরকান্তের।

দেখলো জলের ওপর ছায়া দুটো কখন যেন মিলিয়ে গেছে। তার বদলে এখনও একটা ছায়াই দেখা যাচ্ছে।

সে ছায়া পরাশরের।

পরাশর ছিল ওদের সহপাঠি। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিল একসঙ্গে। লেখাপড়া ভাল লাগে না ওর। তাই বছরখানেক যাবৎ

আর স্কুলে আসেনি। পরে জানতে পেরেছিল হরকান্ত—পরাশর ওর বাবার সঙ্গে ডিঙ্গি নিয়ে মাছ ধরে বেড়ায়।

জলের বুকে ছায়াটা যেন একসময় কান্নাতে পরিণত হয়েছে। হরকান্ত যেন স্পষ্টই দেখতে পেল, ব্রহ্মপুত্রের জলে ভাসতে ভাসতে পরাশরের দেহ ওদেরই পাশে ভেসে চলেছে। এতদিনে একটুও পরিবর্তন হয়নি চেহারার। ঠিক আগের মতই আছে।

সাতদিন আগের কথা। ব্রহ্মপুত্রের কূল ছাপিয়ে বন্যার জল সেদিন আছড়ে পড়েছিল ওদের গ্রামে। সেদিনের কথা আজও ভুলতে পারেনি হরকান্ত।

তখন মধ্য রাত্তির। ঘুমিয়ে ছিল হরকান্ত। ঘুমিয়ে ছিল সারা গ্রামের মানুষ। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল মুষলধারে।

হঠাৎ ওর ঘুম ভাঙতে সমবেত আর্ত চীৎকারে ঘুম জড়ানো চোখে শুনতে পেল এক অপার্থিব গুড়ুম গুড়ুম শব্দ। কারা যেন এক নাগারে কামান দাগাচ্ছে বাইরে।

ঠিক তখনই ঘরে ঢুকেছে হরকান্তের বাবা। ডেকে তুলল ওকে। বললে, তাড়াতাড়ি ওঠ বন্যা···

বাবার কথা আর শেষ হল না, খোলা দরজা দিয়ে সুড় সুড় করে জল ঢুকে পড়ল ঘরে। হঠাৎ ছপাৎ ছপাৎ শব্দে ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল ঘরের দেওয়ালে। হরকান্তের বাবা আর স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। উঠে পড়ল চৌকির ওপর।

বাবাকে জড়িয়ে ধরল হরকান্ত। এ রকম সর্বনাশা বন্যা ও জীবনে দেখেনি। চোখের সামনে পৃথিবী যেন তলিয়ে যাচ্ছিল বন্যার জলে। কালো অন্ধকারে ঢেকে গেল চারদিক। আতংকে জ্ঞান হারায় হরকান্ত।

সেই ভয়ংকর রাত কেটে গিয়ে যখন পুবের আকাশে আলো ফুটতে শুরু করেছিল, তখন জ্ঞান ফিরে এল হরকান্তের। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে গ্রামের চেহারাও অনেক পালটে গেছে। জল গ্রামের

বুকে বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি। কিন্তু ধ্বংসের চিহ্ন রেখে গেছে সারা গ্রাম জুড়ে।

একটু সুস্থ হতে বাবার মুখে ও শুনেছিল ক্ষয়ক্ষতির কথা। আর সবচেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছিল পরাশরের মৃত্যুর খবর শুনে।

পরাশর সেই বন্যার রাতে ডিঙি নিয়ে বেরিয়েছিল জলঝড় মাথায় করে বন্যায় ভেসে যাওয়া দুর্গতদের উদ্ধার করতে। কিন্তু আর ফেরেনি পরাশর। জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল সে।

গ্রামবাসীরা মিথ্যে সান্ত্বনায় ভুলিয়ে রেখেছিল পরাশরের বাবাকে। ওরা বলেছিল, পরাশর শহরে মাছ নিয়ে গেছে। দুদিন পরেই ফিরবে। চলছে আর ভাবছে হরকান্ত। ঝিমঝিম করছে ওর মাথা। চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

হরকান্তকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল বৃন্দাবন।—কি হল দাঁড়িয়ে যে।

হাঁটুর দিকে চোখ রেখে হরকান্ত বললে, 'আর হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। চল ফিরে যাই।'

চল—হরকান্তের কাঁধে হাত রাখল বৃন্দাবন। হরকান্ত ব্রহ্মপুত্র নদীর দিকে তাকালো। ব্রহ্মপুত্র নদীর জলে ঈষৎ লালের আভা। বাড়ির দিকে ফিরতেই ওরা দেখতে পেল।—

নৌকাটা। যেটা দূর থেকে আবছা দেখা যাচ্ছিল। ঢেউ-এর দোলায় সোজা নৌকাটা দুলছে।

নৌকাটা আসতেই বৃন্দাবন পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল পাড়ের কাছে। তারপর চীৎকার করে উঠল—যা বলেছিলাম এই দ্যাখ একটা বুড়ো ঘুমুচ্ছে।

হরকান্ত বৃন্দাবনের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। দেখল, নৌকার পাটাতনে একজন বৃদ্ধ শুয়ে আছে। অস্ফুট গোঙানির ক্ষীণ শব্দ ক্রমাগত বেরচ্ছে বৃদ্ধের কণ্ঠ থেকে।

জলের ধারে এগিয়ে গেল হরকান্ত। ওর সাথে বৃন্দাবনও

হাজির হল সেখানে। নৌকাটা পাড়ে একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। রশি ধরে টানতেই নৌকাটা অর্ধেকটা প্রায় পাড়ের ওপর উঠে এল।

—পরাশর! এতদিন কোথায় ছিলি ?—ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ শীর্ণ হাত দুটো শূন্যে তুলে নামিয়ে নিল বুকের কাছে।

চমকে উঠল হরকান্ত।

এই বৃদ্ধই কি তবে পরাশরের বাবা! গ্রামের লোকেরা মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে ওকে।

বৃদ্ধের মুখে তখন একটি শব্দই শোনা যায়—পরাশর! পরাশর!

আর স্থির থাকতে পারল না হরকান্ত। বৃদ্ধের দুঃখে ওর চোখ জলে ভরে উঠল। কেঁদে ফেলল হাউ হাউ করে।

ক্ষীণ কণ্ঠে বৃদ্ধ বললে, কাঁদছিস কেন পরাশর। কোথা ছিলি এতদিন ? হরকান্ত কোন কথা বললো না। সাবধানে নৌকার পাটাতনে পা রাখল।

হরকান্তকে জড়িয়ে ধরতে গেল বৃদ্ধ। কিন্তু পারল না। দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল বৃদ্ধের গাল বেয়ে।

হঠাৎ জরাজীর্ণ দেহটা বার কয়েক কেঁপে উঠে নিঃসাড় হয়ে গেল একসময়। তারপর সব চুপচাপ।

পশ্চিম দিগন্ত তখন শেষ সূর্যের আবির দেওয়া রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে।



আমার যদি একটা ফাউন্টেন পেন থাকত

সমরেশ বসু

[লেখক-পরিচিতি : জন্ম ১৯২৪ সাল, মৃত্যু ১৯৮৮। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় ও শক্তিশালী লেখক হিসাবে সমরেশ বসু ছিলেন এক আশ্চর্য প্রতিভাবান লেখক। তাঁর প্রথম উপন্যাস নয়নপুরের মাটি। ১৯৪৬ সালে পরিচয় পত্রিকায় তাঁর 'আদাব' গল্প বের হয়। এই গল্পটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠা পান। তাঁর 'গামছা' একটি অসাধারণ উপন্যাস। তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্পেও নতুন আলোড়ন আনেন। 'কালকূট' ছদ্মনাম নিয়ে নতুন এক বৈচিত্র্যময় সমাজে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' লিখে বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ আলোড়ন আনেন। ছোটদের জন্যেও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।]

আমার প্রথম শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে ঢাকা শহর। এই ঢাকার একরামপুরেই ১৯২৪ সালে আমার জন্ম। তখন ঢাকা খুব জমজমাট শহর। মনে আছে, লক্ষ্মীবাজারের শেষে রেলিং-ঘেরা গোল ময়দান, যার নাম ছিল ভিক্টোরিয়া পার্ক। আরও এগিয়ে একটা কাঠের পোল ছিল। সেই পোল পার হয়ে রায়সাহেবের বাজার, নবাবপুর। নবাবপুর ছাড়িয়ে রেললাইন, তারপর শুরু হত ধানমণ্ডি আর রমনা। আমাদের বাড়ির ঠিকানা ছিল পঁচিশ নম্বর জিয়স লেন। জমজমাট শহরের সে এক ব্যস্ততম, জমাট ঘিঞ্জি গলি।

আমাদের বাড়ির সামনের দিকটা দোতলা, পিছনে একচালা।

ইটের গাঁথনির পাকা দেওয়াল, কিন্তু টিনের চাল। আমাদের ছিল একান্নবর্তী পরিবার। বাবা-কাকারা ছিলেন সবসুদ্ধ তিন ভাই। মেজোকাকা দেশে, গ্রামের বাড়িতেই থাকতেন। শহরে ছিলেন বাবা আর ছোটকাকা। বাবা প্রথম দিকে কাঠের ব্যবসা করতেন। আসাম, রংপুর থেকে কাঠ আসত, তারপর সেই কাঠ ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় চালান যেত। কিন্তু সেই কাঠের ব্যবসায় লাভ তো কিছুই হল না উলটে বাবার প্রচুর টাকা জলে গেল। তারপর উনি রূপলাল স্ট্রিটে নায়েবের কাজ নিলেন। বড়দাকেও খুব ছেলেবেলা থেকে চাকরি করতে দেখেছি। বাড়িতে মা, কাকিমা, দিদি, বউদি…এঁদের স্নেহটাই প্রধান ছিল।

এখনকার ছেলেমেয়েরা যেমন তিন-চার বছর বয়স থেকেই বিভিন্ন নার্সারি, ক্রেশ, এসবে যাতায়াত করতে-করতে স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, আমাদের সময়ে তো আর সেসব ছিল না। ছ' বছর বয়সে, বগলে স্লেট আর চক-পেনসিল নিয়ে, বাবা বাড়ির কাছেই লক্ষ্মীবাজারে, গিরিশ মাস্টারমশায়ের পাঠশালায় আমাকে ভর্তি করে দিলেন। আমার জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি গিরিশ মাস্টারমশাইয়ের পাঠশালাতেই। ক্লাস ফোর অবধি ওখানেই পড়েছিলাম।

গিরিশ মাস্টারমশাইয়ের পাঠশালা বলতে লক্ষ্মীবাজারের রাস্তার একধারে একটি একতলা পাকাবাড়ি। ভেতরে তিন-চারটে ঘর। মাস্টারমশাই বলতে একজনই, ওই গিরিশ মাস্টারমশাই। উগ্র চেহারা, গায়ের রং মাজা কালো। চোখা নাক। মাথার বেশির ভাগটা জুড়ে প্রশস্ত টাক, পেছন দিকে অল্প-স্বল্প দু-একগাছি চুল। সবসময় বেত হাতে নিয়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘর ঘুরে বেড়াতেন। আমরা, ছাত্ররা ভীষণ ভয় পেতাম। কারও পাশ দিয়ে চলে গেলে তার গা শিউরে উঠত। সেই বয়সে মনে হত, মূর্তিমান যমদূত!

পাঠশালায় পিরিয়ড, ঘণ্টা এসবের কোন বালাই ছিল না। গিরিশ মাস্টারমশাই তাঁর সুবিধা, সময় অনুযায়ী সব ক্লাস নিতেন।

হয়তো একটা ঘরে ঢুকে বললেন, 'যা, তোদের এখন ছুটি। দুপুরের খাবার খেয়ে আয়।' তারপর পাশের ঘরে ঢুকে বললেন, 'অ্যাই, নামতা মুখস্থ কর।'

গিরিশ মাস্টারমশাই মেজাজেও ছিলেন প্রচণ্ড উগ্র আর রগচটা। কড়া ডিসিপ্লিনে বিশ্বাসী। একদিন ক্লাসে না এলে বাবার চিঠি আনতে হত। না পারলে, সপাং সপাং শব্দে বাতাস কেটে সেই সরু লিকলিকে বেত শরীরের চামড়ায় বসে যেত। ক্লাসে পড়ার সময় গল্প করতাম, পড়া পারতাম না···কত বিচিত্র অপরাধে যে কতবার বেতের আঘাত সহ্য করতে হয়েছে।

আমার প্রধানতম ভয়ঙ্কর অপরাধ ছিল, অনুপস্থিতির কারণ দেখিয়ে আমি কোনদিন বাবার চিঠি আনতে পারতাম না। অবশ্য, পারবই বা কোথা থেকে? তখন, বুড়িগঙ্গার ধারে গরিব মুসলমান জেলেরা (হিন্দু খুব একটা দেখিনি) ঘণ্টায় এক পয়সা হিসেবে ডিঙি নৌকো ভাড়া দিত। এক পয়সা দিলে, এক ঘণ্টার জন্য একটা ছোট বৈঠা আর ডিঙি নৌকা ভাড়া পাওয়া যেত। তখন তো আর ঘড়ি ধরে ঘণ্টা মাপা হত না, নৌকো বাইতে বাইতে চলে যেতাম খালের এদিকে-ওদিকে। ধরা পড়লে, বাড়িতেও চলত আর একপ্রস্থ। তবে, মা খুব একটা মারতেন না। দিদি-ই একটু বেশি চড়চাপড় দিতেন। আর, সবচেয়ে বেশি বিভীষিকার মুহূর্ত আসত, যখন আমার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দিদি বা মা কানে অভিযোগ তুলে দিতেন। তা, আমিও খুব-একটা সুবোধ বালক ছিলাম না। দিদিকে কথায় কথায় ভেংচে দিতাম। সুযোগ পেলে চুল টেনে দিতাম। মেরে-ধরে সিঁড়ি দিয়ে ছাদে ছুট লাগাতাম। অবশ্য দিদিও সমানে তাড়া করত। ধরা পড়লে, মার কাকে বলে বোঝা যেত। তখন মনে হত, এমন ডাকাতিয়া দিদি যেন কারও কোনদিন না হয়!

ক্লাস ফোর অবধি গিরিশ মাস্টারমশাইয়ের পাঠশালায়, এসব বাঁদরামির মধ্যে দিয়েই অঙ্ক শিখেছি, বাংলা যুক্তাক্ষর, সামান্য ইংরেজী

ব্যাকরণ···টেনস, সিঙ্গুলার নাম্বার, প্লুর‍্যাল নাম্বারও কিছু-কিছু শিখতে হয়েছে। তারপর ভর্তি হয়েছিলাম গ্র্যাজুয়েট হাই স্কুলে।

গ্র্যাজুয়েট হাই স্কুলে এসে বই-খাতার সঙ্গে আমার ব্যবধান আরও বাড়তে শুরু করল, বিশাল বড় স্কুল, ঘণ্টা, পিরিয়ড এক-এক বিষয়ে এক-একজন মাস্টারমশাই, প্রশ্ন, উত্তর, ব্যাখ্যা···ধুত! এর থেকে অনেক ভাল তালগাছে উঠে রস খাওয়া কিংবা বুড়িগঙ্গায় নৌকো বাওয়া অথবা গোল্লাছুট কিংবা হাডুডু খেলা। গিরিশ মাস্টারমশাই আমাদের বেত দিয়ে মারতেন, কিন্তু তিনি স্কুলের ছাদে রকমারি ফুলও ফোটাতেন। ওই ছিল তাঁর এক নেশা। লক্ষ্মীবাজারের পাঠশালার ছাদে ফুটে থাকত হরেক রকম গোলাপ, জুঁই, টগর, চামেলি। আর এখানে, গ্র্যাজুয়েট হাই স্কুলে খেলার মাঠও আছে, বিশাল-বিশাল ক্লাসঘর, ডেসক,চেয়ার-বেঞ্চ সবই আছে, কিন্তু সবেতেই কেমন যেন স্কুল-স্কুল গন্ধ! আমি হাঁফিয়ে উঠছিলাম।

আসলে এই পড়াশোনা ভাল না লাগা বা হাঁফিয়ে ওঠা ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে এক রহস্য। কেন পড়াশোনা ভাল লাগত না, কী করলে ভাল লাগত এগুলির কোনও ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না। হয়তো ওই টিপিক্যাল এডুকেশন সিস্টেমটাকে নিজের ভেতর থেকে নিজেই প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলাম। তবে একাকী, ব্যক্তিগত প্রতিরোধের এই রাস্তাটা বড় দুর্গম আর কষ্টসাধ্য।

তবে, আমাদের বাড়িতে অনেক বই ছিল। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র। এরা অবশ্য তখন প্রাপ্তবয়স্কদের লেখক হিসেবে বিবেচিত হতেন। এ ছাড়াও কলকাতার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ থাকায়, বাড়িতে 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' এ-সমস্ত বইও প্রচুর আসত। তা, অকালপক্ক ছেলেকে নিয়ে গুরুজনদের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। সেই বয়সেই আমি গোগ্রাসে, তারিয়ে-তারিয়ে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র,···বুঝি বা না-বুঝি, হাতের কাছে যা পেতাম, সমস্তই পড়ে ফেলতাম। তখন থেকেই লেখার একটা ইচ্ছে মনের

মধ্যে জন্ম নিচ্ছিল। মনে হত, আমিও একদিন এঁদের মতো লিখব, না-বলা কথা নতুন করে সবাইকে জানাব।

গল্প শুনতেও খুব ভাল লাগত। আমার মা এক আশ্চর্য কথক ছিলেন। ঢাকা জেলার নিতান্ত গ্রাম্য আটপৌরে ভাষায় আমার মা গল্প করতেন। ব্রতকথার গল্প। মঙ্গলচণ্ডী, নাটাইচণ্ডী এ সমস্ত ব্রত।

এই সমস্ত ব্রতপালনের পরিবেশও ছিল খুব রোমাঞ্চকর। যেমন বাতি নিভিয়ে, অন্ধকার পৌষের রাতে হত নাটাইচণ্ডীর ব্রত। উপচার থাকত ধান, দূর্বা, পান, সুপুরি, সিঁদুর আর কলাপাতায় সাজানো নতুন চালের নুনবিহীন পিঠে। গায়ে চাদর জড়িয়ে অন্ধকারে দিদি, বউদির গা ঘেঁষে বসতাম। অন্ধকারে মায়ের মুখ থেকে ভেসে আসত সেই সওদাগরের কাহিনী, যে তার আদরের ছেলেমেয়েদের সৎ মার কাছে রেখে সপ্তডিঙা ভাসিয়ে চলে যায় বাণিজ্যে। সৎ মা তাদের খেতে দেয় না, দূর-দূর করে, গরু ছাগল চরাতে দেয়, শেষ পর্যন্ত হত্যার ষড়যন্ত্র করে। অবশেষে নাটাইচণ্ডীর বরে সর্বস্বান্ত সওদাগর ফিরে পায় তার হৃত ধন, খুঁজে পায় ছেলেমেয়েদের।

গ্র্যাজুয়েট হাই স্কুলে আমি পড়েছিলাম ক্লাস সিক্স অবধি। বড়দা তখন নৈহাটিতে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন মাস্টার ছিলেন। তা, পড়াশোনা কিছু হচ্ছে না দেখে বড়দা ওঁর কাছে নিয়ে এলেন। ওখানে নরেন্দ্র হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম।

ক্লাস এইটের পর বড়দাও আশা ছেড়ে দিলেন। আসলে সেই সময়টায় পড়াশোনা বাদ দিয়ে আর সব কিছু করছি। যেমন ছবি আঁকছি, গান গাইছি, বন্ধুরা মিলে হাতে লেখা ম্যাগাজিন বার করছি, ম্যারাপ বেঁধে ত্রিপল খাটিয়ে থিয়েটার করছি—দারুণ সব এক্সাইটিং ব্যাপার-স্যাপার। দু-একজন মাস্টারমশাই আবার এসব ব্যাপারে আমাদের খুব উৎসাহ দিতেন। যেমন, অনাদি ভট্টাচার্য। ইনি ইংরেজির মাস্টারমশাই ছিলেন। অবিবাহিত যুবক। আরও

একজনের কথা এ-বিষয়ে মনে পড়ছে। তিনি ইতিহাসের মাস্টার-মশাই ছিলেন, নাম ছিল নির্মল সেন।

পাড়ার সব বন্ধুবান্ধব মিলে দল করে, 'সিরাজদৌল্লা', 'দেবলা দেবী' এ সমস্ত নাটক করতাম। আমি সেসব নাটকের নাট্যকারও ছিলাম না, পরিচালকও ছিলাম না। অভিনয় করতাম, ব্যাস্, এই অবধি! এমনিতেই ছাত্র সমরেশের কথা বলতে গিয়ে আমি সমরেশ যথেষ্ট বিপাকে পড়েছি. অভিনেতা সমরেশের কথা তাই আর বলছি না।

তা, এই সময়টায় আজ ঢাকা, কাল নৈহাটি এ সমস্ত করে বেড়াচ্ছি। একটা সময়ে বিয়ে করেও ফেললাম।

চাকরি? আমি জীবনে একটিমাত্র চাকরি করেছি, সেটি ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে। ঢুকেছিলাম ড্রয়িং অফিসে ট্রেসার হিসেবে, পরে ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিয়ে ড্রাফটস্ম্যান হয়েছিলাম। চাকরির সময়কালটা ছিল উনিশশো তেতাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশের ডিসেম্বর অবধি।

ছুটির অবকাশে বা কাজের শেষে রাত্রে চটকলগুলোর পাশে, গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়িয়েছি, বস্তিতে-বস্তিতে গিয়েছি ট্রেড ইউনিয়নের কাজে। তখন থাকতাম জগদ্দলে। ভোররাতে অন্ধকার থাকতে রাস্তার মিউনিসিপ্যালিটির জলকলে স্নান করে, নাকে-মুখে কিছু গুঁজে ছুটতাম শ্যামনগর স্টেশনে, সেখান থেকে ট্রেনে ইছাপুর। দৈনিক বেতন এক টাকা চার আনা। রক্ত জল করে, হাড়ভাঙা ওভারটাইম খেটে যখন জগদ্দলে ফিরে আসতাম, তখন আমার কুটিরে জ্বলত কেরোসিনের কুপি। সেই ক্লান্তি ও অবসাদকে কোনও মতে দূরে সরিয়ে, হ্যারিকেনের আলো নিয়ে আবার লিখতে বসতাম। তবে, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। কেরোসিনও প্রায়ই মিলত না। টালির সেই ঘরে, জোড়াসন করে বসে, জলচৌকির উপর একটা কাগজ রেখে লিখতাম। মাঝে-মাঝেই ঘরের পাশে কাঁচা নর্দমার দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসত। পলেস্তারা খসে যাওয়া

জীর্ণ দেওয়ালে বর্ষায় মাঝে-মাঝে সাপেরা দেখা দিত। শুয়োপোকা বেয়ে উঠত গায়ে, বিছে কিলবিলিয়ে চলে যেত পায়ের ওপর দিয়ে। তখন আমার ভীষণ শখ ছিল একটা ফাউণ্টেন পেনের। বার-বার দোয়াতে কলম ডুবিয়ে লিখতে-লিখতে স্বপ্ন দেখতাম ! ইশ আমার যদি একটা ফাউণ্টেন পেন থাকত।

না, বিখ্যাত সাহিত্যিকদের কাউকেই তখন দেখিনি। এখনকার ছেলেমেয়েরা যেমন বইমেলায় সরাসরি লেখকের সঙ্গে কথা বলতে পারে, তাঁকে প্রশ্ন করতে পারে, তখন তো আর সে সমস্ত ছিল না। যদিও পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ, বিষ্ণু দে, নীরেন রায়, গোপাল হালদার, চিন্ময় সেহানবিশ অনেকেরই সাক্ষাতে এসেছি, কিন্তু তখন তাঁদের কাছে যাওয়ার কথা ভাবলেই ভয় করত।

ইছাপুরে চাকরি করতে-করতেই রাইফেল ফ্যাক্টরির ইনস্‌-পেকটরেট অব স্মল আর্মস-এর নকশা ঘরে বসে লিখেছিলাম আমার জীবনের প্রথম উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি'। যদিও আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ'। জীবনের প্রথম মুদ্রিত লেখা 'আদাব'। ছাপা হয়েছিল উনিশশো ছেচল্লিশ সালের শারদীয়া 'পরিচয়' পত্রিকায়।

অগ্রজ সাহিত্যিকদের কাছ থেকে উৎসাহ বা প্রেরণা অনেক পেয়েছি। তবে, বিশেষ একটি ঘটনার কথা মনে আছে, যা আগেও হয়তো লিখেছি। 'আদাব' গল্প প্রকাশের অতি উদ্দীপনায়, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আর-একটি গল্প পাঠিয়েছিলাম। উত্তরে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'আপনার দ্বিতীয় গল্পটি যেহেতু প্রথম গল্পের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে না, সেইহেতু গল্পটি ফেরত পাঠালাম। অবিলম্বে নতুন আর-একটি গল্প পাঠান।' একজন নতুন লেখকের দৃষ্টি সজাগ করার, ভাবনাকে জিজ্ঞাসু করার ভাল উপায় এর থেকে আর কী হতে পারে ?

ঊনপঞ্চাশের ডিসেম্বরেই চাকরি শেষ। রাজনৈতিক কারণে আমাকে যেতে হয়েছিল জেলখানায়। কিন্তু আজ থাক। সে আর-এক নতুন গল্প। নতুন অভিজ্ঞতা।

দাদুকে নিয়ে গল্প

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



[লেখক-পরিচিতি ঃ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। এঁর রচনার নিজস্ব স্টাইল দেখবার মত। ইনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। এঁর বিশিষ্টতা ও বৈচিত্র্যময় লেখনী উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৪ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।]

বাঁচবার কথা নয়। তবু দাদু বেঁচে গেলেন। ভয়ঙ্কর এক দুর্ঘটনার হাত থেকে। একেই বোধ হয় বলে ভাগ্য।

দেখে দাদুর বয়স আন্দাজ করা মুশকিল। লম্বা, একহারা সিঙ্গেমার্কা চেহারা। হাঁটেন একটু কুঁজো হয়ে। চোখে সরু লেন্সের চশমা। মাথার চুল কাঁচাপাকায় মেশানো। কপালে পরপর অনেকগুলো ভাঁজ। শরীরের তুলনায় মুখের রঙ বেশ কালচে। রোদে পোড়া মতন। চোয়ালের হাড় ঠেলে ওঠায় গালের দুদিক গর্তে ঢুকে গেছে। কটা চোখ। দেখলেই বোঝা যায় লিভারের গণ্ডগোলে ভুগছেন দাদু।

দাদু বছর দুই হল গোড়খারায় আছেন। শিয়ালদহ সাউথ স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে সোনারপুরে নেমে গোড়খারায় পৌঁছতে হাঁটাপথে মিনিট পাঁচেকের মত সময় লাগে। দাদু আগে থাকতেন দমদমে। ভাড়া বাড়িতে। একখানা ছোটঘর। পরপর দু ছেলে নটবর আর হলধরের পর মেয়ে আন্না হলে জায়গার অকুলান হয়। তখনই

গোড়খারায় কাঠা তিনেকের মত জমি দাদু কেনেন সস্তায়। তারপর এদিক সেদিক থেকে ধার দেনা করে টালীচালে দুখানা ইঁটের ঘর তুলে সেখানে চলে যান।

দাদুর চাকরিস্থল কলকাতার ডালহৌসী অঞ্চল। কয়লাঘাটার এক আধা সরকারী অফিসে কেরানীর কাজ করেন। কেটে-কুটে মাস মাইনে যা পান তাতে আক্কার বাজারে সংসার চলার কথা নয়।

কিন্তু দাদু খুব হিসেবী তাই যা হোক করে সামাল দিচ্ছেন সব দিক।

আজ মাসের চৌঠা। মাইনের দিন। ফি-মাসের মত আজকেও তিনি ক্যানিং স্ট্রীট গিয়েছিলেন। দুটো পয়সা আদায়ের জন্য। হরলিকস, দুই প্রস্থ সাবান, নারকেল তেলের কৌটো, দাঁত মাজার পাউডার, ব্লেড, ভুষোর কালি, ছেলেদের জন্য খাতা কাগজ ইত্যাদি। সাতসতের মাস কাবারি মাল নেহাত কম নয়। তারপর ট্রামে বাসে যা ভিড়, পকেটে কয়েকটা টাকা, ক্যানিং স্ট্রীট থেকে দাদু হেঁটে ফিরছিলেন শিয়ালদহ।

স্বভাবেই দাদু ভিতু। তা চলা ফেরার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট সতর্ক। কিন্তু, আজ তিনি কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। আর তখুনি দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। শিয়ালদহে চৌ-রাস্তার মোড়ে এসে হঠাৎ নটবরের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। সকালে অফিসে বেরুবার আগে তিনি দেখে এসেছিলেন ছেলেটার জ্বর দুই-এর কিছু বেশি। কলকাতা থেকে গোড়খারার দূরত্ব খুব একটা না হলেও একেবারেই গণ্ডগ্রাম। দাদুর বাড়ির পূবে মস্ত বড় ধু-ধু ধানক্ষেত। মাসখানেক হল বর্ষার জলে টইটম্বুর। পাড়ায় বাঁদর ছেলের অভাব নেই। দলে পড়ে দিনকতক নটবর ধানক্ষেতে নেমে বর্ষার নতুন কইমাছ ধরেছে। ব্যাস আর যায় কোথায়। পড়েছে জ্বরে। মাসের শেষ। পকেট গড়ের মাঠ। দাদু টুক-টাক হোমিওপ্যাথি জানেন। কদিন নিজেই ঔষুধ দিয়েছেন। কাল রাতে গিন্নী বলেছে, 'সাত-আট দিন হয়ে গেল। ছেলেটার

জ্বর ছাড়ছে না কিছুতেই। ভাল বুঝছি না। এবার একজন ডাক্তার দেখাও।'—মুখে কিছু না বললেও ভেতরে ভেতরে দাদু ঘাবড়ে গেছেন রীতিমত। বৃষ্টি বাদলার দিন। মরে যাবে টাইফয়েডে।

হাত ঘড়িতে চোখ পড়তেই চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন দাদু। সাতটা বেজে পঁচিশ। হাতে আর মোটে মিনিট পাঁচেকের মত সময়। যে করেই হোক ট্রেন ধরতে হবে। মতি মিত্তিরের চেম্বার সোনারপুর স্টেশনের গায়েই। কাঁটায় কাঁটায় আটটায় বন্ধ হয়ে যায়। মতি মিত্তির সোনারপুরের সবচেয়ে নাম করা ডাক্তার।

আর এই চটজলদি ভাবনাটাই হয়েছিল কাল। দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দাদু লাগিয়েছিলেন ছুট। একেই শিয়ালদহ মোড় বিপজ্জনক। ট্রাম, বাস, লরী, টেম্পো, ভ্যান, রিক্সা, ঠেলাগাড়ি, ভিড় অষ্টপ্রহর লেগেই আছে। তার ওপর ঘরমুখো অফিস ফেরতা ট্রেনযাত্রীর হুড়োহুড়ি। পড়েছিলেন গিয়ে সোজা এক ডবল ডেকারের মুখে। বগলে ছাতা, দু' হাতে দুটো মাল-ভর্তি পলিথিনের ব্যাগ, পথশ্রমে ক্লান্ত শরীর। তবু হয়ত দাদু নিজেকে সামলে নিতে পারতেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পেছন থেকে একজন ধাক্কা মারতে টাল রাখতে পারেননি। চোখের নিমেষে সেঁধিয়ে গিয়েছিলেন যন্ত্র দানবটার গহ্বরে। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে একটা হিম করা আওয়াজ ফুঁকে উঠেছিল—'গেল, গেল……'

হ্যাঁ, অবিশ্বাস্যভাবেই বেঁচে গেলেন দাদু। একেই বলে কপাল। রাক্ষুসে চাকাটা বেঁকে দাঁড়াল। বুকের নীচে ফেলতে গিয়েও একেবারে ঠেলে দিল। অর্থাৎ দুই চাকার মাঝখানের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় গিয়ে ছিটকে পড়ল দাদুর দেহ।

তারপর কয়েক সেকেন্ডের জন্য চিন্তাভাবনা, বোধশক্তি সব স্তব্ধ হয়ে যায়।

হঠাৎ করে ধড় থেকে মুন্ডু আলাদা হয়ে গেলে যেমন হয়।

এদিকে ততক্ষণে গজ দুই কি তিন এগিয়ে গিয়ে গুলি বেঁধা বিশাল পাগলা হাতির মত বিকট আর্তনাদ করে থেমে গেল ডবল ডেকারটা।

মুণ্ডু আর ধড় ফের জুড়ে যেতে খেয়াল হল দাদুর—তিনি যন্ত্রদানবের একেবারে পেছনের দিকে দৌড়ে গেছেন। তার বুকের ভেতর ঘঁক ঘঁক শব্দে একটা প্রকাণ্ড মালগাড়ির ইঞ্জিন ছুটে যাচ্ছিল। আত্মস্থ হয়ে তিনি কনুইয়ে ভর রেখে আড় চোখে বাসের তলা থেকে দেখতে পেলেন—পিলপিল করে শতশত মানুষের ছুটন্ত পা ক্রমশঃ বাসের চারদিকে জড়ো হচ্ছে আর সেই সঙ্গে কানে তালা লাগানো চিৎকার, হট্টগোল।

এরকম বিপদেও কিন্তু দাদু বুদ্ধি হারালেন না। ইচ্ছে করলে তখনই তিনি অনায়াসে হামাগুড়ি দিয়ে বাসের তলা থেকে বেরিয়ে চলে আসতে পারতেন। কিন্তু বেরুলেন না চট করে। কলকাতার মারমুখী খ্যাপা মানুষজনকে তিনি হাড়ে হাড়ে চেনেন।

দাদু জানেন, ঝট করে বেরিয়ে পড়লেই সকলের দৃষ্টি পড়বে তার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে থাকবেন। কেউ কেউ তাকে অন্ধকারে, মুখ খিস্তি করবে। মওকা পেয়ে কেউ হয়ত দু' চার ঘা বসিয়েও দেবে। সবচেয়ে বড় ভয় পুলিশের। তাকে ধরে নিয়ে যাবে থানায়। কোন রকমে যদি তিনি বেফাঁস কিছু বলেন তা হলে তো আর রক্ষা নেই। আত্মঘাতী ব্যক্তি যদি দুর্ঘটনার আগে ধরা পড়ে যায় তাহলে মাসখানেকের জন্য হাজত বাসও হয়ে যেতে পারে।

তাই বেশ কিছুটা সময় দাদু ঘাপটি মেরে পড়ে রইলেন বাসের তলায়। তারপর একসময় দেখেশুনে বেরিয়ে এলেন।

দাদুর ভাগ্য ভাল বলতে হবে। ভিড়টা চারপাশ থেকে পাতলা হয়ে সামনের দিকে জড়ো হয়েছে। জনকয়েক অতি উৎসাহী ছোকরা মাডগার্ডে উঠে হাত বাড়িয়ে ড্রাইভারকে সীট থেকে টেনে হিঁচড়ে নামাবার চেষ্টা করছে। তখন কে বাসের পেছন দিক থেকে বেরিয়ে এল কি না এল কে তা দেখতে গেছে।

দাদু গুটিগুটি হেঁটে পাশের ফুটপাতে উঠে পড়লেন।

তাজ্জব ব্যাপার।

এত বড় একটা দুর্ঘটনার পরেও তার শরীরে কোন জ্বালা-যন্ত্রণা নেই। এমনকি নিজেকে ভাল করে দেখলেন তিনি, কোথাও রক্তপাত তো দূরের কথা—সামান্য কেটে-ছিঁড়েও যায়নি। শরীর তো তুলোর মত হাল্কা লাগছে। পরক্ষণেই কারণটা ধরতে পারলেন দাদু। তাই তো একেবারে ঝাড়া হাত পা তিনি। ছাতা, দু-দুটো পলিথিনের ব্যাগ ভর্তি জিনিসপত্র, মায় হাতঘড়ি, চশমা পর্যন্ত লোপাট।

'হায়' 'হায়' করে উঠলেন দাদু। ভাববার মত আর সময় নেই। বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই ফের রাস্তায় নেমে বাঁচলেন দাদু। তারপর এক দৌড়ে সাউথ স্টেশন।

উল্লেখযোগ্য শব্দভাণ্ডার ও অনুশীলনী

শৈশব-স্মৃতি

উল্লেখযোগ্য শব্দভাণ্ডার—[প্রস্তর—পাথর। শিল—মাইল স্টোন (ইংরাজী শব্দ)। কৌতূহলাবিষ্ট—আগ্রহ সহকারে উৎসুক। মাইল—ইংরেজী শব্দ—পথের সীমা নির্ধারণ। তৎপরে—তারপরে। চটি—আস্তানা, জুতা বিঃ (গোড়ালির পিছনদিক খোলা)। যথার্থই—ঠিক। সম্ভাষণ—আবাহন। অবধারিত—নিশ্চিত নির্ণয়। সমভিব্যাহারীরা—সঙ্গীরা। শৈশব—বাল্যকাল। কৌশল—বুদ্ধি। আরম্ভ—শুরু। রাস্তায়—পথে।]

অনুশীলনী

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : ১। 'ও শিল নয়, উহার নাম মাইল স্টোন।'—কে কখন একথা বলেছিলেন? ঐ মাইল স্টোনের সাহায্যে লেখক ঈশ্বরচন্দ্র কিভাবে ইংরেজী শিক্ষালাভ করেছিলেন? ২। 'এইটি ইঙ্গরেজীর এক আর এইটি ইঙ্গরেজী নয়'—বক্তা কে? এই ঘটনা বক্তাকে কি শিখতে সাহায্য করেছিল? ৩। 'তিনি আমাকে সাত মাইল স্টোনটি দেখিতে দিলেন না।' তিনি কে? কাহাকে দেখিতে দিলেন না? কেন দেখিতে দিলেন না? তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল কিনা বল।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : ১। রাস্তায় আধ ক্রোশ অন্তর দূরে পোঁতা পাথরকে কি বলে? ২। শিয়াখালার সালিমার বাঁধা রাস্তা থেকে কলিকাতা কত মাইল? ৩। শৈশবকালের ঘটনা বলতে কি বোঝ?

মৌখিক প্রশ্ন : ১। সমভিব্যাহারী শব্দের অর্থ কি? ২। 'ইঙ্গরেজী অঙ্ক চিনিয়া ফেলিত।' কার উক্তি? ৩। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কি জান?

ভবচন্দ্র রাজা গবচন্দ্র মন্ত্রী

উল্লেখযোগ্য শব্দভাণ্ডার—[বুদ্ধিবিদ্যা—বিচক্ষণতা। লোকপ্রবাদে—যে কথা লোকসমাজে প্রচলিত হয়ে থাকে। রাজসমীপে—রাজার কাছে। জন্তু—জানোয়ার বিশেষ (প্রাণীবাচক)। পুষ্করিণী—পুকুর। পাকশাক—রান্নার আয়োজন। অসৎ—খারাপ। গুরুতর—ভয়ানক। দর্পণ—আয়না। শূলে—এক প্রকারের শাস্তি-বিধান—মৃত্যুদণ্ড। পরামর্শ—আলোচনা। জ্যোতিষ—

জ্যোতির্বিদ্যা শাস্ত্র। প্রাণত্যাগ—দেহ বিসর্জন। সম্রাট—রাজা। পাপাত্মা—পাপপরায়ণ। আহ্বান—ডাকা। ভবলীলা—ইহলোক ত্যাগ। দ্বারিগণ—রক্ষিগণ।]

অনুশীলনী

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ ১। কেন গল্পটি পড়ে হাসির বলে মনে হল? ২। এই গল্পের শেষে ভবচন্দ্র ও গবচন্দ্রের কি হল? ৩। বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়ে লেখক তাদের সম্বন্ধে কি বলেছেন?

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ ১। ভবচন্দ্রের ও গবচন্দ্রের বিদ্যা-বুদ্ধি কতখানি? ২। গবচন্দ্র সিন্দুকে গিয়ে লুকিয়ে থাকে কেন? ৩। দুজন পথিক কোথায় কি করছিল? ৪। নগর রক্ষিগণ তাদেরকে দেখে কি ভাবল? ৫। রাজা ভবচন্দ্র কি আদেশ দিলেন? ৬। শাস্তি পাবার পর চোররা কি বলল? ৭। কিভাবে ভবচন্দ্র আর গবচন্দ্রের জীবনলীলা শেষ হল?

মৌখিক প্রশ্ন ঃ—১। গল্পটি কার লেখা? ২। লেখক সম্বন্ধে কি জান? ৩। বুদ্ধি বলতে কি বোঝ? ৪। 'পাকশাক' কাকে বলে?

দান-প্রতিদান

উল্লেখযোগ্য শব্দভাণ্ডার—[সহোদর—আপন ভাই। গ্রাম—পল্লী। সম্পর্ক—সম্বন্ধ। প্রীতিবন্ধন—মধুর বন্ধন। সুন্দরী—রূপসী। পরামর্শ—আলোচনা। অনুরোধ—অনুগ্রহ। নির্ভর—অবলম্বন। বঞ্চনা—প্রতারণা। অবজ্ঞা—অনাদর। সমস্ত—সব। সন্দেহ—সংশয়। উচ্ছ্বসিত—আনন্দিত। মানসিক—মনের দিক। ঘুম—নিদ্রা। জীবন—প্রাণ। শান্তভাবে—স্থিরভাবে। সংসার—পারিবারিক বন্ধন (স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ বসবাস)। দীর্ঘনিঃশ্বাস—দুঃখসূচক সশব্দনিঃশ্বাস। বিচ্ছিন্ন—আলাদা। বিষতুল্য—গরল বিষের ন্যায়। নির্দিষ্ট—নির্ধারিত। সম্পত্তি—স্থাবর মালিকানা স্বত্ব। মহৎ—সুন্দর। বিদ্বেষ—হিংসা। বিপরীত—উল্টো। ছাপ—রেখা। শুভদিন—আনন্দের দিন। ব্যাধি—অসুখ। বিস্ময়—আশ্চর্য। মৃদু—নরম।]

অনুশীলনী

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ ১। গল্পটি থেকে সে সময়ের যৌথ পরিবারের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা কর। ২। গল্পটি থেকে ভাইয়ের মনের ক্রমবিকাশ বর্ণনা কর। ৩। রাধামুকুন্দ ও শশিভূষণের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক ছিল?

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ ১। ব্রজ গৃহিণীর আক্রোশের কারণ কি? ২। রাধামুকুন্দ কিভাবে দাদার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছিল? ৩। শশিভূষণ ভাইকে কি ক্ষমা করেছিল?

মৌখিক প্রশ্নঃ ১। গল্পের নামকরণের সার্থকতা কি? ২। 'দান-প্রতিদান' কাকে বলে? ৩। 'কোথায় ছিল ব্রজসুন্দরী, কোথায় ছিল রাসমণি' এ কথার অর্থ কি? ৪। গল্পটি কোন্ গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে? ৫। কিভাবে ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন হল? ৬। যাত্রাগান সম্বন্ধে কি জান?

লালু

উল্লেখযোগ্য শব্দভাণ্ডার—[ইস্কুল—বিদ্যালয়। প্রিয়—ভাল। কদাচিৎ—কখনও। পুঁজি—সম্বল। কুলি মজুর—শ্রমিক। সর্বদাই—সবসময়। তামাসা—মজা। প্রস্তুত—তৈরী। উপস্থিত—হাজির। অদ্ভুত—আশ্চর্য। ক্ষীণ—দুর্বল। নষ্ট—খারাপ। আর্তকণ্ঠ—কাতরকণ্ঠ। ছিন্নকণ্ঠ—কাটাগলা। নালিশ—অভিযোগ। অন্তিম—শেষ। বহুকণ্ঠ—অনেকের গলার আওয়াজ। আবেদন—প্রার্থনা নিবেদন। ধ্বনি—শব্দ। গর্জন—চিৎকার। গণ্ডগোল—গোলমাল। গুরুদেব—শিক্ষাদাতা। জগৎজননী—জগৎমাতা। ক্রন্দন—কান্না। আদেশ—নির্দেশ। অদ্ভুত—আশ্চর্য। মিলিয়ে—মেলানো।]

অনুশীলনী

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নঃ ১। লালুকে সবাই কি চোখে দেখত? স্কুল ছাড়ার পর লালু কি করতো? পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে কি করতো? ২। লালু কে, সবাই-এর সেরা ছিল কিসে? তার চরিত্রের প্রধান দোষ কি ছিল? ৩। কি দেখে লালু ক্ষেপে গিয়েছিল? আর তখন সে কি বলেছিল ও কি করেছিল?

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ ১। লালুর ক্ষ্যাপা চেহারা দেখে কে কি বলেছিল লেখো। ২। লালুর আসল উদ্দেশ্য কি ছিল? তার এই আচরণ তুমি সমর্থন করবে কিনা বল। ৩। লালু বলিদান করতে প্রথমে রাজী হয়নি, শেষে সে কেনই বা রাজী হল?

মৌখিক প্রশ্নঃ ১। লালুর স্কুলের বন্ধুরা তাকে এত ভালবাসত কেন? ২। সে তাহাদের কি কি কাজ করে দিত? ৩। সে যে তার বন্ধুদের ভালবাসত, তার প্রমাণ কি? ৪। কালী পুজোর দিনে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল কেন?

ফার্ষ্ট ক্লাশ ভূত

উল্লেখযোগ্য শব্দভাণ্ডার—[ইস্কুল (ইংরাজী শব্দ)—বিদ্যালয়। ম্যালেরিয়া—এক প্রকার রোগ। সাধারণতঃ মশার কামড় থেকে এই অসুখের

সূত্রপাত। অঞ্চল—জায়গা। সম্পর্ক—সম্বন্ধ। আদর—যত্ন খাতির ইত্যাদি। প্রস্তুত—তৈরী। সতর্ক—সাবধান। জীবন—প্রাণ। পাড়াগেঁয়ে—পল্লীগ্রাম। ফার্ষ্টক্লাশ—প্রথম শ্রেণী।]

অনুশীলনী

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ ১। গল্পের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে সারদা সম্বন্ধে তোমার নিজস্ব বক্তব্য বর্ণনা কর। ২। সারদা দাদা কিভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতেন? ৩। বাড়ীতে তাঁর কে ছিলেন? তিনি সারদা দাদাকে কিভাবে সাহায্য করতেন?

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ ১। সারদা দাদা কি গল্প বলতে ভালবাসতেন? ২। ভূতের গল্প শুনতে গিয়ে দাদার কি হয়েছিল? ৩। সাহেবরা কি এদেশে আর মরে না? ৪। সাহেবরা না মরলে তারা ভূত হবে কি করে? কথাটি কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?

মৌখিক প্রশ্ন ঃ ১। গল্পটি কার লেখা? ২। বীরবল কার ছদ্মনাম? ৩। 'সবুজ পত্র' কি? ৪। ফার্ষ্টক্লাশ ভূত গল্পের নামকরণ প্রসঙ্গে তোমার কি মত? ৫। সারদা দাদা কিভাবে নির্যাতিত হয়েছিল?

রাজভোগ

উল্লেখযোগ্য শব্দভাণ্ডার—[চোপেদার—চাপরাসী গোছের লোক। লপেটা—এক ধরনের পাদুকা। রয়েল সেলুন—বিশেষ সম্মানিত লোকের জন্য নির্দিষ্ট ঘর। (এটি ইংরাজী কথা) সাগ্রহে—আগ্রহের সহিত। অর্ডার (ইংরাজী কথা)—আদেশ, ফরমাইজ। রসুই ঘরের—রান্না ঘরের। খোয়া ক্ষীর—জলশূন্য, শুকনো ঘন দুধ। পোষ্টাই—হৃষ্টপুষ্ট হবার উপযুক্ত। লটঘটি—গোলমাল-ব্যাপার। বাবুর্চিদের—রান্না করে এমন পুরুষ মানুষকে আরবী ভাষায় এই বলে ডাকে। মর্মাহত—মনে আঘাত পাওয়া, দুঃখিত হওয়া।]

অনুশীলনী

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ ১। কেন গল্পটি পড়ে হাসি পায় বল? ২। বিরিয়ানী পোলাও রান্নার বর্ণনাটি তুমি নিজ ভাষায় লেখ। ৩। এখানে অনেক বিদেশী খাবারের নাম আছে। তুমি কতকগুলি দেশী খাবারের নামের একটি তালিকা কর।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ ১। 'অ্যাংলো-মোগলাই' হোটেলের ম্যানেজারের নাম কি? তিনি কিভাবে পাতিপুকুরের রাজাবাহাদুরকে অভ্যর্থনা

করলেন ? ২। পাতিপুকুরের মহারাজার বয়স কত ? তাঁর চেহারার কি রূপ ও কেন ? ৩। হোটেলের ম্যানেজার কি কি খাদ্যদ্রব্য তাঁর হোটেলে পাওয়া যায় বলেছিলেন ? ৪। 'রোগা লোকের গায়ে গত্তি লেগে ভুঁড়ি গজায়,'—একথা কে কার কোন্ কথায় বলেছিল ? ৫। রাইচরণের উত্তম সরভাজার কাহিনীটি কি ?

মৌখিক প্রশ্ন ঃ ১। লপেটা বলতে কি বোঝ ? ২। এই গল্পে উল্লিখিত কোন খাবার তুমি পছন্দ কর ? ৩। তুমি কোন সুখাদ্য বানাতে পার কি ? কিভাবে বানাবে বল ?

বনে-পাহাড়ে

উল্লেখযোগ্য শব্দভাণ্ডার—[অপূর্ব—আশ্চর্য। সম্মুখের—সামনের। শৈলচূড়া—পর্বতশিখর। আকাশপুরী—আকাশের রাজ্য। ইন্দ্রজাল—মোহাবিষ্ট। শৈলশিখরবাসী—পাহাড়ে অরণ্যে যাদের বসবাস। অভ্যন্তরে—ভিতরে। প্রস্তর সংকুল—পাথরসমূহ। বনস্পতি—বনরাজ্য। শীর্ষদেশ—উপরিভাগ। আস্তানায়—নিলয়ে। আশৈশব—বাল্যকাল হইতে।]

অনুশীলনী

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ ১। 'আমাকে এক অপূর্ব সূর্যোদয় দেখালেন।'—কে কাকে কোথায় এই সূর্যোদয় দেখালেন ? ২। সূর্যোদয়ের শোভাটি বর্ণনা কর। দর্শকের সংখ্যা ও তাদের পরিচয় কি ? ৩। 'শৈলশিখরবাসী সামান্য কুয়াশায় দিনের আলোর সামনে মিলিয়ে গেল'—এর উৎস ও প্রসঙ্গ সম্বন্ধে তোমার সুচিন্তিত মত প্রকাশ কর।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ ১। হো-পোগা-মারো গাঢ়া কি ? তার পার্বত্য অঞ্চলের বর্ণনা দাও। ২। হো কারা ? এদের জীবনযাত্রার কথা বল। ৩। অজানা আকাশপুরীর অদৃশ্য হস্তের ইন্দ্রজাল কথাটি বুঝিয়ে দাও।

মৌখিক প্রশ্ন ঃ ১। লেখক ও তার সহযাত্রীরা মোট কয়জন ? ২। সরকারের কোন্ বিভাগের কর্মচারী তাদের সঙ্গে ছিলেন ? ৩। ঐ সব কর্মচারীদের পদমর্যাদা কিরূপ ? ৪। কেরোসিন না পেলেও কাদের অসুবিধা হয় না ? ৫। বন্যহস্তীরা কিসের আঘাতে বনস্পতিদের দুর্দশা করেছিল ?

রাজবন্দীর জবানবন্দী

উল্লেখযোগ্য শব্দভাণ্ডার—[অভিযোগ—নালিশ। রাজবিদ্রোহী—রাজার বিরুদ্ধে বিপ্লব। রাজদণ্ড—রাজার শাস্তি। সত্য—নির্ভুল, ন্যায়। জাগ্রত—জীবন্ত। ভগবান—ঈশ্বর। নিযুক্ত—নিয়োগ। ধনী—বড়লোক।

দরিদ্র—গরীব। আইন-বিধি—নিয়মকানুন। রুদ্র—ভীষণ। পরমানন্দ—পরম আনন্দ। বাণী—ভাষা। মৃত্যু—মরণ। কৌশলে—উপায়ে। বিদ্রোহ—বিপ্লব। অহংকার—গর্ব। আত্মবিশ্বাস—নিজের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা।]

অনুশীলনী

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ ১। প্রবন্ধটির সারমর্ম নিজের ভাষায় লেখ। ২। 'দোষ তাঁর যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বীণা বাজান।'—উক্তিটি কার? দোষ তাঁর বলতে কাকে বোঝান হয়েছে? ৩। লেখক তথা কবি ভগবানকে 'বীণা বাদক' ও 'প্রধান রাজবিদ্রোহী' বলেছেন কেন? উপমার সাহায্যে বল।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ ১। রাজদণ্ড কার হাতে থাকে? ২। রাজার পক্ষে আর কারা কাজ করেন? তাঁরা কি রাজার পক্ষে স্বেচ্ছায় থাকেন? ৩। রাজার রাজা কে? তাঁকে লেখক মহাবিচারক বলেছেন কেন?

মৌখিক প্রশ্ন ঃ ১। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'—কার জবানবন্দী? ২। রাজবিদ্রোহী কাকে বলে? ৩। 'বীণা বাদক'—এ কথার তাৎপর্য কি? ৪। সত্যের জয় কি ভাবে হয়? ৫। কবি সম্বন্ধে কি জান?

বিদ্যাসাগর

উল্লেখযোগ্য শব্দভাণ্ডার—[ধন্যবাদ—কৃতজ্ঞতা। অনুগ্রহ—করুণা। আশ্চর্যান্বিত—বিস্মিত। মহত্ত্ব—মহান গুণসম্পন্ন কাজ। নিযুক্ত—নিয়োগ। স্বীকৃত—স্বীকার। পণ্ডিত—বিদ্বান। পুরস্কৃত—পারিতোষিক, পুরস্কার পাওয়া। সৌভাগ্য—সৌভাগ্যের অধিকারী। স্ত্রীশিক্ষা—নারীশিক্ষা। বিস্তার—প্রসার। ইচ্ছুক—অভিপ্রায়। অধ্যয়ন—পড়াশোনা। পূর্বে—আগে। উৎকৃষ্ট—সুন্দর। শক্ত—কঠিন। দুঃখিত—দুঃখী। অভিরুচি—অভিপ্রায়। রক্ষা—উপায়। অনুরোধ—মিনতি। অসম্ভব—যা সম্ভব নয়। জিজ্ঞাসা—প্রশ্ন। কার্য—কাজ। আন্দোলন—আলোড়ন। প্রশংসাযোগ্য—সমাদর। মুশকিল—বিপদ।]

অনুশীলনী

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ ১। নাটক ও গল্পের মধ্যে তফাত কি? এই নাট্যাংশে কাকে তোমার ভাল লাগে? ২। 'বিদ্যাসাগর' নাট্যাংশটিতে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায় তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ। ৩। 'আচ্ছা, আমি খুব দুঃখিত পণ্ডিত'—এটি কার উক্তি? পণ্ডিত ব্যক্তিটি কে? বক্তা কি জন্য দুঃখিত?

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ ১। মার্শাল সাহেব কে ছিলেন? বিদ্যাসাগর কার উপাধি? তিনি কার অধীনে কি করতেন? মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে কি অনুরোধ করেন? ২। বিদ্যাসাগর মার্শাল সাহেবকে কি অনুরোধ করেন? এই অনুরোধে কোন্ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল? সেই সমস্যা কিভাবে নির্ধারিত হয়?

মৌখিক প্রশ্নঃ ১। 'মার্শাল'—এর শেষ সংলাপটি তুমি নাটকীয় ভঙ্গীতে বল। ২। বিদ্যাসাগর 'অন্য লোক দেখুন' বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন? ৩। 'আমি খুব দুঃখিত পণ্ডিত'—কে কাকে একথা বলেছিল? ৪। বনফুল কার নাম?

জীবন স্মৃতি

উল্লেখযোগ্য শব্দভাণ্ডার—[সুদূর—দূরে। অতীতে—পূর্বে যা ঘটেছে। ছবি—দৃশ্য। নামাজ—মুসলমানদের প্রার্থনা। শব্দ—আওয়াজ। বৃষ্টি—বর্ষণ। রঙিন—রঙ বেরঙ। সামগ্রী—জিনিসপত্র। স্কুল—বিদ্যালয়। সুন্দর—যা ভালো। চঞ্চু—ঠোঁট।]

অনুশীলনী

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নঃ ১। 'ভাসা ভাসা কয়েকটি ছবি আমার মনে উদয় হয়'—লেখকের মনের মধ্যে কি ভাব ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা দাও। ২। মশা-মাছি তাড়ানো আর বাবুই বাসা বোনার-কাহিনী সম্বন্ধে কি জান? ৩। কে কখন নামাজ পড়তেন? সুরা কি? কার মনে অপূর্ব অনুভূতি জাগে?

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ ১। কাছারি ঘরে কে কি করেন? ২। প্রাকৃতিক পরিবেশ কেমন তা বল। ৩। কিন্তু তালগাছ দুটির নিকটে আসিয়া সকল ভুলিয়া যাইতাম—কে কেন কি ভুলে যেতেন? তিনি তালগাছ দুটির নিকটে আসলেই বা ভুলতেন কেন? ৪। বাবুই পাখির বাসা তৈরীর কৌশলটা সহজ কথায় বুঝিয়ে লেখ।

মৌখিক প্রশ্নঃ ১। জীবন স্মৃতির অর্থ কি? ২। নক্সী কাঁথা কাকে বলে? ৩। পুঁথি কি? তুমি কি কোন পুঁথি পড়েছ? ৪। জানকী কে? সে কোথায়, কেন এসেছে? ৫। 'অমুকের বাড়ী' কথার তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

পুতুল রাজার দেশে

উল্লেখযোগ্য শব্দভাণ্ডার—[নানারকম—অনেক রকম। দ্বীপ—জলবেষ্টিত চারধার, মাঝে স্থল। পিকিং—ইংরাজী শব্দ, চীনের রাজধানী। নিঝুম—

নিস্তব্ধ, নীরব। দৈত্য—দানব। যাদুকর—যাদু বিদ্যায় পারদর্শী। প্রচণ্ড—ভয়ানক। প্রাচীর—দেওয়াল। অভয়—ভরসা। ভূমিকা—প্রস্তাবনা। মায়াবী—মায়া। সিংহাসন—রাজার বসবার নির্দিষ্ট স্থান। মন্ত্রবলে—বশীকরণবলে। হুকুম—আদেশ। বিরাট প্রকান্ড। ফটক—দরজা। প্রহরী—পাহারাদার। অসহায়—নিঃসহায়।]

অনুশীলনী

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ ১। গল্পটির ভিতর যে জায়গাটিতে দৈত্যরাজ তার সেনাপতিকে পুতুল রাখালকে ধরে আনার কথা বলেছে তার বর্ণনা দাও। ২। 'আমাকে পাখী করে দিন'—কে কাকে কার উদ্দেশ্যে বলেছেন এবং কেন? ৩। গল্পের পরিণতির কথা বর্ণনা কর।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ ১। দৈত্যরাজ হিং টং সম্বন্ধে কি জান? ২। কে বা কারা রাখাল পুতুলকে ধরে নিয়ে এলেন? ৩। কং সং সম্বন্ধে কি জান? ৪। লিনলিন সিনসিন সম্বন্ধে কি জান? ৫। যাদুকর মায়াবী আংটি দিয়ে কি দেখলেন?

মৌখিক প্রশ্ন ঃ ১। গল্পের নামকরণ সম্বন্ধে তোমার কি মত? ২। 'প্রেমেন্দ্র মিত্র' সম্বন্ধে কি জান? ৩। গল্পটিতে কি রূপকথার পরিচয় পাওয়া যায়? ৪। পুতুলদের মধ্যে কাকে তোমার ভাল লাগল? ৫। কং সং, লিনলিন, সিনসিন সম্বন্ধে কি জান?

নরুনের বদলে নাক

উল্লেখযোগ্য শব্দভাণ্ডার—[কাহিনী—চরিত্র। বিনিময়—বদল। পৃথিবী—জগৎ। সূত্রপাত—শুরু। অর্ধেকটা—অর্ধেক। বই—পুস্তক। প্রতিবেশী—এক পাড়ায় বসবাসকারী। সর্বস্ব—সব। আমীর—রাজা। ফকির—সাধু। আশ্চর্য—অবাক। অবিশ্বাস—বিশ্বাসের বাইরে। গিন্নী (স্ত্রীলিঙ্গ)—গৃহকর্তার স্ত্রী। বন্ধু—সতীর্থ। হাসিমুখে—হাস্যমুখে। আঁচল - প্রান্ত। রেগে—ক্রোধে। পছন্দ—মানান সই, মনোমত। হারানো - হারিয়ে যাওয়া। জীবন—প্রাণ।]

অনুশীলনী

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ ১। 'নরুনের বদলে নাক' এই নামকরণের পেছনে যে কৌতুক সৃষ্টি করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দাও। ২। বিনিকে নিয়ে যে কাহিনীর সূত্রপাত তার বর্ণনা কর। ৩। 'কাল, কাল কেন এখন গেলেই তো হয়'—কে কাকে বলেছে?

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: ১। বিনি কে? তার সম্বন্ধে কি জান? ২। 'দিদিমণি চেয়ে নিলেন ফের'—কে কাকে কার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে? ৩। গল্পের শেষে কি হল?

মৌখিক প্রশ্ন: ১। গল্পটি কার লেখা? ২। লেখক সম্বন্ধে কি জান? ৩। গল্পটি কি হাসির? তা হলে কেন হাসির বল।

পাঠান মুলুকে

উল্লেখযোগ্য শব্দভাণ্ডার—[পেঁছানো—উপস্থিত হওয়া। মুসাফির—ফকির। বিকল—বাদ। বন্ধ—আবৃত। প্ল্যাটফরম (ইংরাজী শব্দ —গাড়ী থামার নির্দিষ্ট স্থান। উৎসাহ—আগ্রহ। চীৎকার—আর্তনাদ। স্বাভাবিক—সহজ। ইজ্জত—সম্মান। শুভলগ্ন—শুভদিন। আলিঙ্গন—কোলাকুলি। আরম্ভ—শুরু। উঁচু—লম্বা। বন্ধু দর্শনে—বন্ধুর দেখা। ফিরিস্তি—ফর্দ। প্রশ্ন—জিজ্ঞাসা। আন্তরিকতা—হৃদয়ের স্পর্শ। সম্বর্ধনা—অভ্যর্থনা। সম্পূর্ণ সমস্ত। কায়দায়—ভঙ্গীমায়। ততোধিক—অত্যধিক। অবজ্ঞা—ঘৃণা।]

অনুশীলনী

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন: ১। পাঠানদের চালচলন কেমন? ২। পাঠান মুলুকের লেখক পাঠানদের সম্বন্ধে কি বলেছেন তার বর্ণনা দাও। ৩। পাঠানরা কেমন ভাবে অভ্যর্থনা করে? দুর্বল লোকদের দেখলে তারা আনন্দিত হয় কেন?

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: ১। পাঠানদের স্বাধীনচেতা ভাবটি সম্বন্ধে তোমার কি মত? ২। 'ভদ্রলোক আমাকে চেনেন না'—ভদ্রলোক কে? কাকে চেনেন না? কিভাবে পরিচয় হল বল। ৩। এই প্রবন্ধের নামকরণ সম্বন্ধে তোমার কি মত?

মৌখিক প্রশ্ন: ১। লেখক কোথায় ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন? ২। লেখক কোন্ দেশের বাসিন্দা ছিলেন? ৩। পাঠানরা কোন্ ভাষায় কথা বলে? ৪। এই রচনাটি কোন্ গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে? ৫। সৈয়দ মুজতবা আলী সম্বন্ধে কি জান?

সীমান্ত পার হয়ে

উল্লেখযোগ্য শব্দভাণ্ডার—[নিঃশব্দে—নীরবে। ধীর—শান্ত। পাড়—ধারে। শব্দ—আওয়াজ। চিকচিক—উজ্জ্বল। নরম—কোমল। সন্তর্পণে—

সাবধানে। স্পষ্ট—পরিষ্কার। থমকে—চমকে। লক্ষ্য—দৃষ্টি। মাঝি—যারা নৌকা চালায়। ডরে—ভয়ে। লম্বা—বড়। অন্তরঙ্গভাবে—আন্তরিকতার সাথে। সহকারী—সতীর্থ। বন্যা—প্লাবন। স্রোত—ঢেউ। অবিরাম—অশ্রান্ত। পৃথিবী—ধরিত্রী। চিহ্ন—ছাপ। ডিঙি—একরকমের ছোট নৌকা। অবাক—আশ্চর্য। কণ্ঠ—স্বর। বৃদ্ধ—বুড়ো। জরাজীর্ণ—জীর্ণশীর্ণ। কেঁপে—কম্পন। চুপ—নীরব।]

অনুশীলনী

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন : ১। এই গল্পটিতে অসহায় বৃদ্ধ পিতার পুত্রের জন্য যে উৎকণ্ঠা ও বেদনা তার সম্বন্ধে কি জান? ২। এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র হিসাবে হরকান্তর চরিত্র ও সমবেদনার কথা কি জান? ৩। পরাশর কেমন ভাবে বন্যায় ভেসে গেল তার বর্ণনা দাও।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : ১। পরাশর সম্বন্ধে কি জান? ২। বৃন্দাবন কে? ৩। হরকান্ত নৌকা দেখে কি বলেছিল? ৪। গ্রামে কি ভাবে বন্যা এসেছিল?

মৌখিক প্রশ্ন : ১। গল্পের নামকরণ সম্বন্ধে তোমার কি মত? ২। ব্রহ্মপুত্র নদী সম্বন্ধে কি জান? ৩। পরাশর, দুর্গতদের জন্য গিয়েছিল কেন? ৪। বন্যা কিভাবে এসেছিল?

আমার যদি একটা ফাউন্টেন পেন থাকত

উল্লেখযোগ্য শব্দভাণ্ডার

[ছাত্রজীবনে—শিক্ষাকালে। একপ্রকার—একরকম। বিড়ম্বনা—বিপদ। স্কুলের—বিদ্যালয়ের। শৈশব—বাল্যকাল। ওতপ্রোতভাবে—অঙ্গাঙ্গীভাবে। ময়দান—মাঠ। ঘিঞ্জি—সরু। প্রচুর—অনেক। অভ্যস্ত—অভ্যাস। মাস্টারমশাই—শিক্ষক। ভীষণ—ভয়ানক। অপরাধ—অন্যায়। জেলেরা—মৎসজীবীরা। বিভীষিকা—আতঙ্ক। মূর্তি—চেহারা। সুবোধ—ভাল। ব্যবধান—দূরত্ব। বিশাল—বড়। বন্ধু—সতীর্থ। ফ্যাকটারী—কারখানা। অবকাশে—সময়ে। অন্ধকার—নিষ্প্রদীপ। স্টেশন—নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ী থামে। অবসাদ—ক্লান্ত। বিখ্যাত—খ্যাতনামা। প্রেরণা—উৎসাহ। দৃষ্টি—নজর। জেলখানায়—কারাগারে।]

অনুশীলনী

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। নিজের ছাত্রজীবনের কথা বলতে গিয়ে লেখক তাঁর শৈশবকালের কি কথা বলেছেন ? বর্ণনা দাও।

২। প্রাকৃতিক পরিবেশে স্কুলজীবনের গিরিশ মাস্টারমশাই প্রসঙ্গে লেখক কি বলেছেন ? তাঁর কথা উল্লেখ করে তোমার নিজের কথায় বল।

৩। গ্রাজুয়েট হাইস্কুলের ও নৈহাটি হাইস্কুলের কথা বলতে গিয়ে লেখক কি বলেছেন ?

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

১। লেখকের বাড়ীতে কাদের বই ছিল এবং কিভাবে তিনি পড়তেন ?

২। লেখকের চাকরি জীবন সম্বন্ধে কি জান ?

৩। 'নয়নপুরের মাটি' কাকে স্মরণ করে লেখা ?

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। গিরিশ মাস্টারমশাই ও অনাদি ভট্টাচার্য কে ছিলেন ?

২। 'আদাব' কবে কত খ্রীষ্টাব্দে বের হয় ?

৩। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কে ছিলেন ? লেখককে কি লিখেছিলেন ?

৪। কি কারণে লেখককে জেলে যেতে হয়েছিল ?

৫। সমরেশ বসু সম্বন্ধে কি জান ?

দাদুকে নিয়ে গল্প

উল্লেখযোগ্য শব্দভাণ্ডার

[বাঁচবার—বেঁচে থাকার। ভয়ঙ্কর—ভীষণ। দুর্ঘটনার—বিপদের। ভাগ্য—কপাল। বয়স—বছর। মুশকিল—অসুবিধা। লম্বা—বড়। কটা চোখ—উজ্জ্বল চোখ। লিভারের—পেটের। গণ্ডগোল—গোলমাল। পেঁছিতে—হাজির হতে। বাড়িতে—ঘরে। সস্তায়—সুলভে। ধার—কর্জ। অঞ্চল—জায়গা। কেরানী—কর্মচারী। নেহাত—নিতান্ত। স্বভাব—আচরণ। অন্যমনস্ক—আনমনা। হঠাৎ—অকস্মাৎ। জ্বর—অসুখ। গণ্ডগ্রাম—অজপাড়াগাঁ। বড়—বিরাট। চটজলদি—তাড়াতাড়ি। দিগবিদিক—দুই দিকের মধ্যবর্তী অবস্থা। বিপজ্জনক—বিপদগ্রস্ত। অষ্টপ্রহর—আটপ্রহর। ঘরমুখো—ঘরের দিকে। শরীর—দেহ। নিরাপদ—নিরাপত্তা। ক্ষ্যাপা—পাগল। প্রশ্ন—জিজ্ঞাসা। তাজ্জব—অবাক।

অনুশীলনী

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। 'দাদুকে নিয়ে গল্প'টিতে দাদুর বৈচিত্র্যময় চরিত্রের কি খবর পেলে জানাও।
২। সবচেয়ে কৌতুককর কাহিনীটি বর্ণনা কর।
৩। দাদু কি কি হারালেন এবং কেন হারালেন বল।

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

১। দাদুর চেহারা বর্ণনা কর।
২। ডবল ডেকার কি? দাদুর তাতে কি হল?
৩। দাদু কোথায় চাকরি করতেন?
৪। দাদুর সংসারে কে কে আছেন?

মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। দাদুর চরিত্র কি রকমের?
২। দাদুর বুদ্ধি কি রকম ছিল?
৩। দাদু গল্পের লেখক কে?
৪। তার সম্বন্ধে কি জান?

15/=

12/=